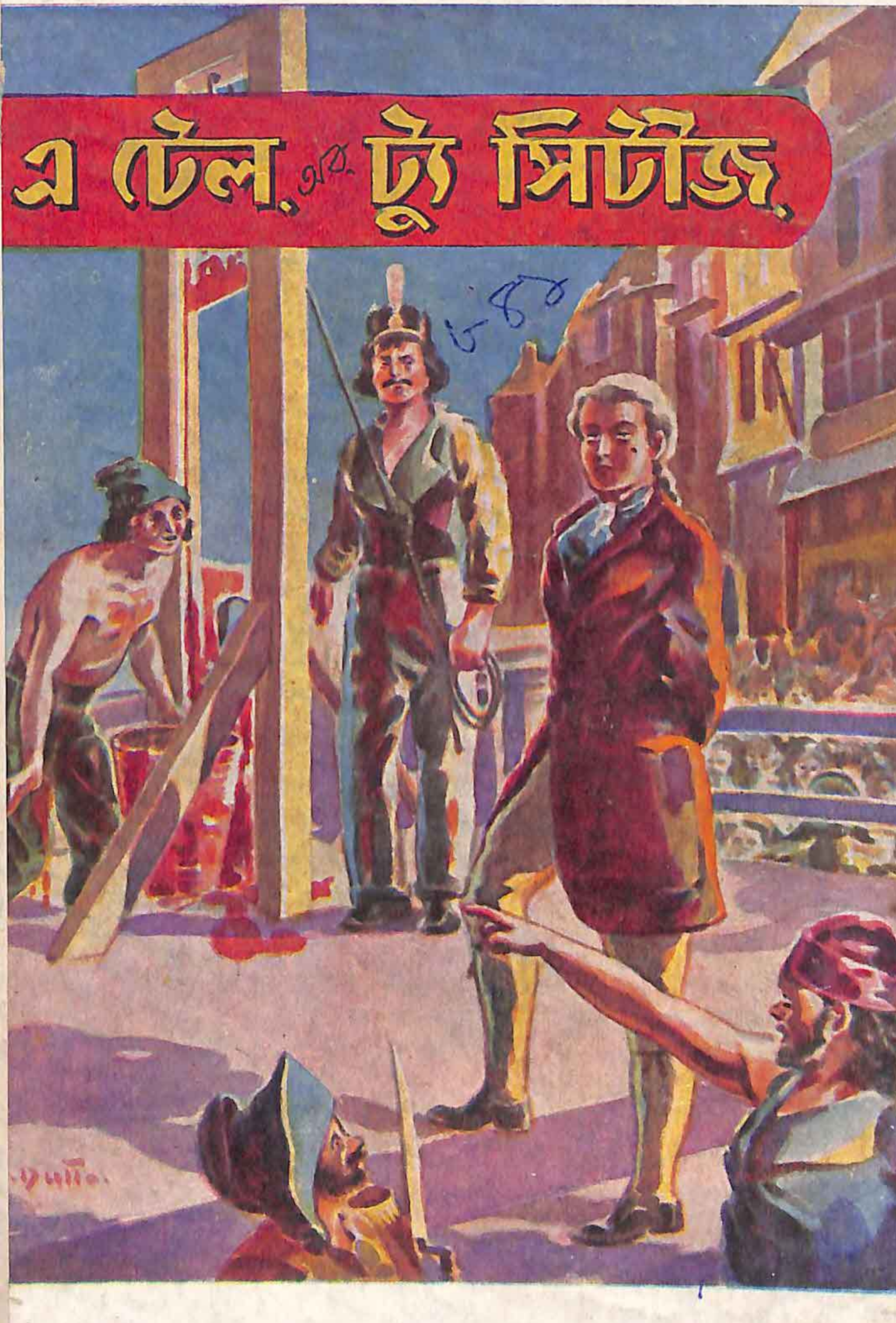

এ টেল অব টু সিটীজ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরির জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ—



এ টেল অব টু সিটিজ

চার্লস ডিকেন্স

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

A TALE OF TWO CITIES
CODE NO.—4-29-001

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

আগস্ট
১৯৮৬
১২

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

এই লেখকের লেখা

লাষ্ট ডেজ অব পম্পেই
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট
লক্ষ টাকার হীরা
মায়ের ডাক
ট্রাজেডি অব সেক্সপিয়ার
সেক্সপিয়ারের কমেডি
অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট
রব রয়
নিকোলাস নিকোলবি
ম্যান্ ইন্ দি আয়রন মাস্ক
টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার
টম ব্রাউন্'স্ স্কুল ডেজ



সেই সামান্য আলোতে একখানা নীচু বেঞ্চিতে ব'সে এক পক্ককেশ বৃদ্ধ আপনমনে সেলাই করছে—জুতো...

এই বইয়ের লেখক

ইংরেজী সাহিত্যের দিকপাল লেখকদের ভিতর চার্লস ডিকেন্স একজন। প্রায় দেড়শো বছর আগে তাঁর জন্ম হয়।

ছেলেবেলায় বড় কষ্টে মানুষ হয়েছিলেন তিনি। পেটের জ্বালায় পথে পথে ঘুরতে হ'ত। পরিচিতের কাছে পেতেন শুধু অবহেলা, অপরিচিতের কাছে অপমান। সেদিনকার সে দৈন্যের জ্বালা সারাজীবন তিনি ভুলতে পারেন নি। তাঁর নানা বিখ্যাত বইয়ের শিশু ও কিশোর চরিত্রের ভিতর দিয়ে সেই জ্বালাই ফুটে বেরিয়েছে নানান ভাবে।

লেখক হিসাবে তাঁর প্রথম খ্যাতিলাভ হয় 'ক্রিসমাস কেরল' প্রকাশিত হবার পরে। বইখানি এখনও লোকের এত ভাল লাগে যে কিছুদিন আগে এক মার্কিন ধনকুবের দু'লক্ষ টাকারও বেশী দাম দিয়ে ওর পাণ্ডুলিপিখানি কিনে নিয়েছেন।

গত শতাব্দীর ইংরেজ লেখকদের ভিতর ডিকেন্স-এর আসন অতি উচ্চে। এ টেল অব ট্যু সিটীজ, পিকউইক পেপার্স, অলিভার টুইষ্ট, ডেভিড কপারফিল্ড— তাঁর এ সব বই সারা পৃথিবীতে সমাদর লাভ করেছে। প্রশ্ন হ'তে পারে— কোন্ বিশেষ গুণে ডিকেন্স-এর লেখা লোকের এত ভাল লাগে? সে-প্রশ্নের উত্তর হবে এই—দলিত নিপীড়িতের উপর গভীর সমবেদনার জন্যই তাঁর লেখা হৃদয় স্পর্শ করে পাঠকের। যখন যে-বই তিনি লিখেছেন, তারই ভিতর ঐ একটা জিনিস সর্বদাই জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে—দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার—শিশুর উপর বয়স্কের, বা গরিবের উপর ধনীর বা প্রজার উপর রাজার। এমনভাবে তিনি প্রাণের দরদ ঢেলে দিয়েছেন দলিত দুর্বলের উপরে যে তারই গুণে তাঁর রচনা হয়েছে কালজয়ী।

আর একটা কথা। ডিকেন্স-এর সাহিত্যিক প্রতিভা ছাড়াও আর একটি জিনিসকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। সে তাঁর পুরুষকার। পথের ভিখারী শিশু একদিন জগতের পূজা লাভে সক্ষম হ'ল। কী ক'রে হ'ল? প্রতিভার সাথে পুরুষকারের মিলন না ঘটলে এমনটা হয় না। যে শ্রমশীলতা আর অধ্যবসায় ডিকেন্সকে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল, তা সকল দেশের সর্ব কালের কিশোরগণের অনুকরণীয়।

এই বইখানি সম্বন্ধে

আগেকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকার পৃথিবীর অমিল অনেক। দু'শো বছর আগে সমাজ ছিল দোতলা। উপরে বাস করত অল্প কয়েকজন রাজা আর জমিদার, নীচে থাকত লাখো লাখো কোটি কোটি গরিব। এই গরিবদের খাটুনির শেষ ছিল না, কিন্তু পেট ভরে খেতে তারা কোনদিন পায়নি। তাদের খাটুনির ফল উপরতলার লোকেরাই ভোগ করত চিরদিন, তারা জোর গলায় দাবি করত যে গরিবেরা তাদের দাসত্ব করবার জন্যই জন্মেছে, গরিবদের শাসন আর শোষণ করবার অধিকার খোদ ভগবানের কাছ থেকেই পেয়েছে বড়রা।

আর আজ? সে-যুগের সে-অনাচারের কিছু অবশেষ এখনও অনেক দেশে রয়েছে বটে, কিন্তু দোতলা সমাজ যে একটা খারাপ জিনিস, একথা আজ সকল দেশে সবাই মানে। পেট ভরে খাবার অধিকার সকলেরই আছে, কেউ কারো দাস হয়ে থাকবে না ভগবানের দুনিয়ায়, বড় শুধু তারাই—যাদের প্রাণ বড়, —এই সব হ'ল নতুন যুগের নীতি। এ-নীতি না মেনে আজকার পৃথিবীতে কোন মানুষ বা কোন সমাজ একদিনও টিকতে পারে না।

এই যে আমূল বদলে গেল পৃথিবীর চেহারাটা, এর মূলে কী ছিল, জানো তোমরা? এর মূলে ছিল ফরাসী দেশের একটা বৃহৎ ঘটনা, যুগ-যুগান্ত মনে থাকবার মত একটা প্রলয় ব্যাপার। দেশের গরিবেরা অত্যাচার সয়ে সয়ে মরিয়া হয়ে উঠল, একজোট হয়ে বিদ্রোহ করে বসল রাজা, জমিদার আর ধনীদের বিরুদ্ধে। ফাঁসীতে ঝুলিয়ে, গিলোটিনে বলি দিয়ে দেশ থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে দিল বড়দের বংশ। এই বৃহৎ ঘটনার নাম ফরাসী বিপ্লব। এরই আদর্শ আর নীতি আজ পৃথিবীটাকে ভেঙ্গে গড়েছে, দলিত মানবের জীবনে এনেছে বাঁচবার অধিকার।

এই বিপ্লবের ইতিহাসকে কাঠামো ক'রে চার্লস ডিকেন্স রচনা করেছেন তাঁর অমর গ্রন্থ "এ টেল অব টু সিটীজ"—"যুগল নগরীর গল্প"। বিপ্লবের আগে দেশের কী অবস্থা ছিল, তার ছবি রয়েছে একদিকে—ডাক্তার ম্যানেটের জুতো সেলাই, ছেলেকে গাড়ীর তলায় চাপা দিয়ে বাপের মুখের উপর মোহর ছুঁড়ে মারা—রক্তের তুলিতে আঁকা সব ছবি। আর অন্যদিকে?—বিপ্লবের পরেকার ছবি—সে-ছবির রেখায় রেখায় ফুটে বেরোয় লেলিহান আগুনশিখা—রাজারাণী

অভিজাত নরনারী গাড়ী বোঝাই হয়ে চালান যায় গিলোটিনের পানে, রক্তের নদী বয়ে যায় ফরাসীদেশের সহরে সহরে। চমক-দেওয়া ঘটনার সমারোহ এ-বইয়ের পাতায় পাতায়।

কিন্তু ঘটনার চমকই "এ টেল অব টু সিটীজ"-এর সবখানি নয়। মানুষের মনের গোপন কোণে সন্ধানী আলো ফেলে সেখানকার যে-ছবি পাঠকের চোখে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন ডিকেন্স, তার চমকও অসাধারণ। সিডনি কার্টন! দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ও-চরিত্রের তুলনা নেই। যাকে সবাই জানে মাতাল ভবঘুরে অকর্মা বলে, হঠাৎ তার ভিতর থেকেই একদিন দেখা দিল এক আপনহারা মহাপ্রাণ প্রেমিক; লুসীর সুখের জন্য সে হাসিমুখে গিলোটিনের তলায় নিজের মাথা পেতে দিল।

এই রকম হাজার চমক-দেওয়া জিনিস আছে এই গ্রন্থে। এই বই সবাইয়ের পড়া উচিত; বিশেষ ক'রে পড়া উচিত ছেলেমেয়েদের—এইজন্য যে এদেশে দোতলা সমাজের যে-সব অনাচার এখনো বজায় রয়ে গেছে, তা দূর করবার দায়িত্ব দু'দিন বাদেই তাদের উপর পড়বে।

এ টেল অব টু্য সিটীজ

এক

গোড়ার কথা

খৃষ্ট জন্মের ১৭৭৫ বৎসর পরে।

নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা। গড় গড় ক'রে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ছুটছিল ডোভারের রাস্তা ধ'রে। মস্ত লম্বা গাড়ী, অনেক লোক তাতে যেতে পারত, কেউ ভিতরে, কেউ ছাদে। তখন রেলগাড়ী ছিল না, ডাক চলাচল করত এই রকম সব ঘোড়ার গাড়ীতে। এ গাড়ীটাও সেই ডাকগাড়ী।

মাত্র সাতাশ মাইল চওড়া সমুদ্রের খাঁড়ি। নাম তার ইংলিশ চ্যানেল। তার এপারে ইংলণ্ড, ওপারে ফ্রান্স। দুই দেশের ভিতর অনবরত লোকের আনাগোনা। এই ডাকগাড়ী ছাড়া সে সব লোকের চলাচলের আর কোন উপায় ছিল না সেকালে। এপারে ওপারে সারা পথটাই চলতে হ'ত ডাকগাড়ীতে; মাঝখানে শুধু খাঁড়িটুকু পার হওয়ার জন্য ছিল জাহাজ।

সেই সন্ধ্যাবেলা।

গাড়ীখানা একটা ছোট পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলেছে। হঠাৎ একজন লোককে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা গেল সেই গাড়ীর দিকে। সে গাড়ীর কাছাকাছি এসেই চীৎকার করে উঠলো—"গাড়ী থামাও!"

ডাকগাড়ীর চালক গাড়ী থামিয়ে দিলো। অশ্বারোহী তখন গাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—টেলসন ব্যাঙ্কের মিঃ লরী এই গাড়ীতে আছেন কি?

গাড়ীর ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি ভদ্রলোক বললেন—আমিই মিঃ লরী! কি দরকার আপনার বলুন।

লোকটা তখন তার পকেট থেকে একখানা খাম বের করল। খামের মুখ আঁটা। সেটা মিঃ লরীর দিকে এগিয়ে ধরে বললো—আপনার চিঠি।

—আমার চিঠি!

—হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া হয়েছে, খুব জরুরী চিঠি।

মিঃ লরী লোকটার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে পড়লেন।

চিঠিখানা খুবই ছোট। তাতে লেখা ছিল—

"মিঃ লরী,

ডোভারের রয়্যাল জর্জ হোটেলে দেরী করবেন একটু। সেখানে আসবেন সেই ভদ্রমহিলা। আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া দরকার!"

চিঠিখানা পড়া হয়ে গেলে মিঃ লরী সেখানাকে আবার খামে বন্ধ করলেন; পকেটে রাখতে রাখতে বললেন—আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।

অশ্বারোহী নমস্কার ক'রে চলে গেল। তার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ একটু একটু ক'রে ঢিমিয়ে এল। দূর থেকে দূরে স'রে যেতে যেতে এক সময়ে তা একেবারে মিলিয়ে গেল।

ডাকগাড়ীখানা আবার ছুটতে লাগলো হাওয়ার বেগে।

পরদিন সকালে ডাকগাড়ীখানা এসে দাঁড়ালো রয়্যাল জর্জ হোটেলের দরজার সামনে।

গাড়ী থামতেই হোটেলের সর্দার খানসামা এগিয়ে এসে মিঃ লরীকে খাতির করে উপরে নিয়ে গেল।

টেলসন ব্যাঙ্ক খুব বড় ব্যাঙ্ক। লণ্ডন আর প্যারী—এই দুই রাজধানীতেই তার বিশাল কারবার। বিখ্যাত ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজ দেখাশোনার ভার মিঃ লরীর উপরে। কাজেই লোক তিনি সামান্য নন। তাঁকে খাতির করবার জন্য যে হোটেলের লোকেরা ছুটে আসবে, একথা না বললেও চলে।

মিঃ লরী হোটেলের ম্যানেজারকে তাঁর জন্য দু'খানা ভাল ঘর

ব্যবস্থা ক'রে দিতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, ঘর তু'খানির একখানিতে থাকবেন একজন তরুণী। তিনিও আজই আসবেন।

তখনই ঘর ঠিক হয়ে গেল।

ঘরে গিয়ে পোশাক বদল করবার সঙ্গে সঙ্গেই সকাল বেলার খাবার নিয়ে এলো একজন খানসামা।

মিঃ লরী তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন, তাঁর ইচ্ছে সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসা।

ডোভার সহরটা ঠিক সমুদ্রের উপরে নয়; একটু দূরে, পাহাড়ের গায়ে। সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে যদি কেউ সহরের দিকে তাকায়, তার হঠাৎ মনে হবে সহরটা সমুদ্রের ভয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। বেশী দূরে যেতে পারেনি; মাঝপথে পাহাড়কে পেয়ে তারই বুকে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। সমুদ্র কিন্তু অত সহজে তাকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সে পেয়াদার পর পেয়াদা পাঠাচ্ছে সহরটাকে ধ'রে আনবার জন্য। সে পেয়াদা হ'ল পাহাড় সমান বড় বড় ঢেউ। সে সব ঢেউ কিন্তু সহরের নাগাল পাচ্ছে না; সহর পাহাড়ের গায়ে অনেক উঁচুতে বসে ঢেউ-পেয়াদাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। ঢেউয়েরা রেগে যাচ্ছে তাতে, লাফিয়ে উঠছে কূলের উপর। তাতে সহরের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না; মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ছে কূলের মাটি। বেড়াবার পক্ষে খুব যে মনোরম জায়গা এটা, তা নয়। একটা সোঁদা আঁশটে গন্ধ ডাঙায়; আর একটা গোলমেলে আওয়াজ জলের দিক্‌টাতে, সে-আওয়াজ শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে যায় মানুষের।

ডোভারে তখন ব্যবসা-বাণিজ্য খুব কমই হতো। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য না ক'রেও হঠাৎ বড়লোক হ'তে দেখা যেতো তু'চার জনকে। কী ক'রে হ'ত? জাহাজ ত' মাঝে মাঝে ডোবে সমুদ্রে! সে সব জাহাজের অনেক মালপত্রই ভাসতে ভাসতে কূলে গিয়ে লাগে। তার ভিতর সোনা দানা হীরে জহরতের বাক্সও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। ডোভারের উপকূলটা এরকম ভাবে বাঁকানো যে ওখানে এসে লাগলে

সে-জিনিস আর ভেসে বাহির সমুদ্রে যেতে পারে না। এখন যেমন সরকারী লোক নিযুক্ত হয়েছে ঐ সব ভেসে-আসা মাল টেনে তুলবার জন্য, তখন তা ছিল না। কাজেই যার সমুখে পড়ত, সেই নিয়ে যেত। কেউ কেউ বড়লোক হয়ে যেত এই ভাবেই। তাই লোভে লোভে ডোভারবাসী সবাই সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত অবসর পেলেই।

সেদিনও ঐ রকম কয়েকজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো সমুদ্রের তীরে। মিঃ লরীর ভাল লাগল না তাদের ঐ রকম ঘোরাফেরা। অনেকক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি হোটেলে ফিরে গেলেন।

বি:কেলের দিকে কুয়াশায় আব্ছা হয়ে এলো চারিদিক। ওপারের ফরাসী-উপকূল ভাল দেখা যায় না আর। সেইদিকে চেয়ে মিঃ লরীর মনে নানা চিন্তার উদয় হ'তে লাগল। দুঃখেরই চিন্তা। পনেরো বছর আগে একটি দু'বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে ফরাসী-দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই দু'বছরের শিশু আজ সতেরো বছরের তরুণী। তাকেই আজ আবার ফরাসীদেশে নিয়ে যাবার দরকার হয়েছে। রয়্যাল জর্জ হোটেলে এসে তারই পথ চেয়ে ব'সে রয়েছেন মিঃ লরী। অবশ্য আজকের দিনটা এমনিতেই তাঁকে অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত, কারণ কালকের আগে আর জাহাজ নেই ওপারে যাবার।

তখন সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে। খাওয়ার ঘরে লোকের ভিড় দেখে মিঃ লরী তাঁর খাবার আলাদা জায়গায় দিতে বললেন। নির্জনে ব'সে চিন্তা করতে চান তিনি। এই যে তরুণীটি আসছেন, কী ভাবে এঁর সঙ্গে আলাপ করবেন তিনি, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না এখনও। -কিন্তু বুঝে প'ড়ে ঠিক হয়ে থাকা দরকার ; তা নইলে বিপদ হবে দু'জনেরই ; তাঁরও, তরুণীরও! নিজের মনকে তিনি আরও সময় দিতে চান তৈরী হওয়ার জন্য।

খাওয়া শেষ হবার আগেই সদরে একখানা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ

শোনা গেল। ছ'মিনিট পরেই একজন খানসামা এসে মিঃ লরীকে জানালো যে, একজন তরুণী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

খানসামা আরও বললো যে, যে ঘরখানা মহিলাটির জন্য আগে থেকে বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছিল, সেইখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি সেই ঘরেই অপেক্ষা করছেন। মিঃ লরী তখন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে সেইদিকে চললেন। ঘরের ভিতর আলো অতি কম, সহসা তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না, কিন্তু একটি মিষ্টি কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন ; কে যেন তাঁকে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ ক'রে উঠলো। মিষ্টার লরী এইবার ঠাহর করে দেখলেন—সামনেই একটি তরুণী আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, টুপি হাতে ক'রে। মেয়েটির বয়স বছর সতের। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, বেশ সুন্দরী। মাথায় এক রাশ সোনালী চুল।

মিঃ লরী নমস্কার করলেন। অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের যেরকম নমস্কার করা উচিত এক তরুণীকে, সেই ভাবেরই এ নমস্কার। কারণ, পরিচয় যেটুকু হয়েছিল একদিন, তা এ-মেয়েটির মনে থাকবার কথা নয়। পনেরো বছর আগে এই লুসী ম্যানেটকে তিনিই ফরাসীদেশ থেকে কোলে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন অবশ্য, কিন্তু এই দীর্ঘ পনেরো বছর একে আর দেখবার সুযোগ হয়নি তাঁর। তিনি যখন টেলসন ব্যাঙ্কের লণ্ডন-অফিসের খাতাপত্রের তদারকে ব্যস্ত, তখন লুসী ম্যানেটের তদারক করছিলেন পল্লী-অঞ্চলের এক বিদ্যালয়ের পরিচালক। অবশ্য, ব্যাঙ্ক থেকেই যোগানো হয়েছে লুসীর সমস্ত খরচা।

মেয়েটিই কথা বললো প্রথমে।—ব্যাঙ্ক থেকে কাল একখানা চিঠি পেয়েছি, আমার বাবার টাকাকড়ি বিষয়-আশয়ের সম্বন্ধে। শুধু টাকাকড়িই নয়, বাবার নিজের কথাও কিছু আছে চিঠিতে। এতদিন পরে এ-রকম চিঠি এল—এতে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বাবাকে আমি চোখেও দেখিনি ; শুনেছি যে আমার জন্মের কয়েকমাস আগেই—

মিঃ লরী নীরবে শুনে যান মেয়েটির কথা।

মেয়েটি বলে চলে—ব্যাঙ্কের চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছে—এই হোটেলে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি আমায় নিয়ে যাবেন প্যারী-নগরে···আমার পিতার সেই বিষয়-আশয়ের সম্বন্ধে যেমন দরকার হবে, তেমনি ব্যবস্থা করবার জন্য।

মিঃ লরী বললেন—হ্যাঁ, সেই রকমই কথা আছে বটে! .

মেয়েটির কথা তখনও শেষ হয়নি! সে বললো—চিঠিতে এ-কথাও লেখা ছিল—এই ব্যাপার সম্বন্ধে সব-কিছু আপনার কাছেই জানতে পাবো আমি।

মিঃ লরী কিভাবে তাঁর কথাটা স্থুরু করবেন, তা ভেবে ঠিক করবার আগেই মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, আপনি কি একেবারেই অপরিচিত আমার?

এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে মিঃ লরী পাল্টা প্রশ্ন করলেন—অপরিচিত নই কি?

দারুণ দোনা-মনায় পড়লে মানুষের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। মেয়েটির কপালেও দেখা দিল সেই রেখা। খুবই চিন্তিত ভাবে সে ধীরে-ধীরে ব'সে পড়লো চেয়ারে। এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েই ছিলো।

আগের কথা একেবারেই চাপা দিলেন মিঃ লরী। এই যেন নূতন পরিচয় হ'চ্ছে তাদের, সেই ভাবে বলতে স্থুরু করলেন, "কুমারী ম্যানেট! আমি ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসার কথাই আপনার সঙ্গে বলতে এসেছি। ব্যবসার ব্যাপারেই আমাদের এক মক্কেলের জীবনের কোন কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছি আমরা, সে সব কথাই বলতে চাই আপনাকে।"

—মক্কেলের কথা!

—হ্যাঁ, মক্কেলের কথা। যাঁরা আমাদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন করেন, তাঁদেরই আমরা বলি মক্কেল। ভদ্রলোক ছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক, উঁচুদরের পণ্ডিত—চিকিৎসক।

—তাঁর বাড়ী কি বোভেয়াতে?

—হ্যাঁ, আপনার পিতা মঁসিয়ে ম্যানেটের মত, এ ভদ্রলোকও

ছিলেন বোভেয়াবাসী। মঁসিয়ে ম্যানেটের মত, এঁর খ্যাতি ছিল দেশে। প্যারীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় আমার। বৈষয়িক লেনদেন নিয়েই আলাপ অবশ্য, তবে একটু গোপনীয় ব্যাপার ছিল এর ভিতর। আমি তখন আমাদের প্যারীর অফিসে। সে আজ কুড়ি বছর আগের কথা।

—কি বললেন? কুড়ি বছর আগের কথা?

—হ্যাঁ, কুড়ি বছর আগের কথা। তিনি বিবাহ করেন একটি ইংরেজ-মহিলাকে। তাঁর সম্পত্তির ভার ছিল আমার উপর। ও-রকম অনেক ফরাসী-ভদ্রলোকেরই সম্পত্তির ভার আমায় নিতে হয়েছিল তখন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে।—নিছক ব্যবসায়ের দিক দিয়েই সম্পর্ক, ওতে বন্ধুত্ব নেই, দরদ তো নেই-ই। সারাদিন ব্যাঙ্কে ব'সে মক্কেলের পর মক্কেলের হিসাব যেমন পরীক্ষা করি, ঠিকই তেমনই, মক্কেলের পর মক্কেলের বৈষয়িক সুবিধা কিসে হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখি আমি। ও আমার কর্তব্য। কর্তব্য ক'রে যাওয়ার একটা কল আমি, আর কিছু নই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম! সেই বোভেয়াবাসী ভদ্রলোক মারা গেলেন। যদি না যেতেন—ওকি! চমকে উঠছেন কেন?

লুসী সত্যিই চমকে উঠে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে মিঃ লরীর হাত, নিজের দু'হাত দিয়ে। মিঃ লরী বুঝতে পারলেন, লুসীর মনে ভয় হয়েছে, যদিও কিসের ভয়—তা সে জানে না। তাই তাকে সাহস দেবার জন্যে বাপ যেমন মেয়ের হাত ধরে—তেমনি ভাবে তার হাত চেপে ধরে শান্তভাবেই বলতে থাকেন—

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম! ঐ ভদ্রলোক যদি মারা না যেতেন! মিস্ ম্যানেট, আপনি মনে মনে একটা ধারণা গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করুন। ধারণা করুন যে ভদ্রলোকটি মারা যান নি, মারা যাওয়ার বদলে তিনি হঠাৎ হারিয়ে গেছেন, অসাধারণ শক্তিমান কোন শত্রু তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অতি গোপন জায়গায় এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছে যে তাঁর কোন খোঁজ তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা শত চেষ্টাতেও

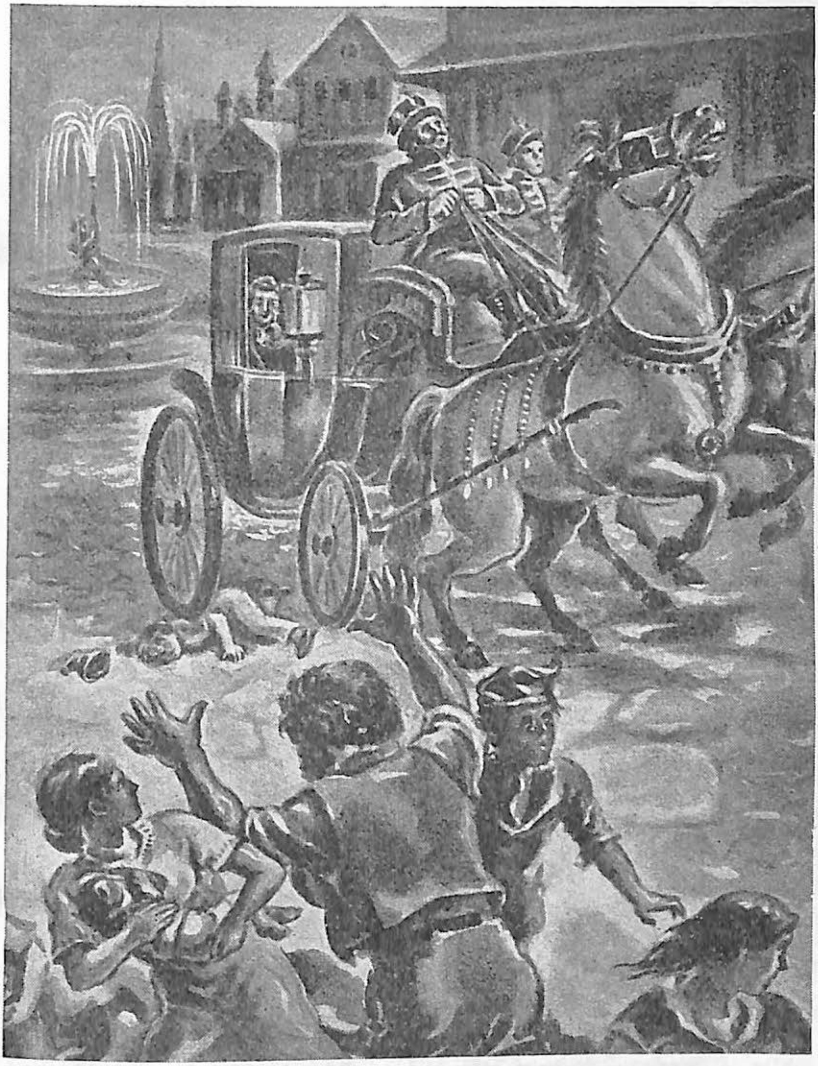
পাচ্ছে না—! ধারণা করতে পারছেন? তাহ'লে এখন বুঝে দেখুন যে সেই অভাগা ভদ্রলোকটির কী অবস্থা!

এই পর্যন্ত ব'লে একটু থামলেন লরী, বোধ হয় মিস্ ম্যানেটকে তৈরী হবার সময় দেওয়ার জন্য। তারপর আগের চেয়ে নীচু গলায় বললেন—ঐ বোভেয়াবাসী ডাক্তারটির যে অবস্থা আপনি ধারণা করতে পেরেছেন, ঠিক সেই অবস্থাই ঘটেছিল ডাক্তার ম্যানেটের, আপনার পিতার!

লুসী ম্যানেট তাকিয়ে আছে। তার চোখের চাউনিতে ভয় আর সংশয় মাখামাখি। সে-অসহায় দৃষ্টি দেখে দুঃখ হ'ল মিঃ লরীর। কিন্তু দুঃখ পেয়ে কথা চেপে গেলে ত চলবে না! তিনি আবার বলতে লাগলেন—হ্যাঁ, এ-রকম ব্যাপার ঘটে ফরাসীদেশে···প্রচুরই ঘটে! ফ্রান্সের যাঁরা ধনী মানী প্রবল জমিদার—তাঁরা ইচ্ছে করলেই, যে-কোন ব্যক্তিকে ব্যাষ্টিল কারাগারে আবদ্ধ করতে পারতেন, যা এখনও পারেন—সারা জীবনের মত। এক-রকম সরকারী ফর্ম, ছাপানো কাগজ আছে। সেই ফর্ম পূরণ ক'রে দিলেই হলো। যার নাম লিখে দেওয়া হবে, সে অন্তর্ধান করবে সঙ্গে সঙ্গে। তার স্ত্রী-কন্যা গিয়ে রাজা-রাণীর পায়ে নিজের কলিজা ছিঁড়ে উপ্‌ড়ে দিলেও কিছু হবে না। আর আত্মীয়-স্বজনেরা সংবাদটি পর্যন্ত পাবে না যে, সে অভাগা বেঁচে আছে না মরে গেছে। এ-রকম ঘটনা ঘটে থাকে ফরাসীদেশে। যে ভাগ্যহীন বোভেয়াবাসী ডাক্তারের কথা আমি বলছিলাম আপনাকে, তাঁর স্ত্রীরও ভাগ্যে এমনি ঘটনাই ঘটেছিল।—যদিও তাঁর সাহস ছিল অসীম, ধৈর্যের তুলনা ছিল না। তা হ'লেও—স্বামীর এ রকম অদ্ভুত ভাবে হারিয়ে যাওয়ার ব্যথা তিনি বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না। একটি সন্তানের জননী তিনি। সন্তানটি যখন জন্মগ্রহণ করল, তখন তাঁর স্বামী অন্তর্ধান করেছেন···

বাধা দিয়ে নীচু গলায় লুসী বললো—সন্তানটি, বোধ হয় মেয়ে?

মিঃ লরী উত্তর করলেন—হ্যাঁ, মেয়েই বটে। মেয়েটি দু'বছরের হতে-না-হতেই তার মাকেও সে হারালো। বুদ্ধিমতী জননী একটি



...ঘোড়ারা লাফিয়ে উঠতেই গাড়ী থামাতে হলো। মার্কুইস মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন,—"হলো কি?"

কৌশল ক'রে গিয়েছিলেন মরবার আগে। মেয়েকে জানিয়েছিলেন যে তার বাবা মৃত।

লুসীর সারা দেহ থেকে-থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো। মিঃ লরী বললেন—স্বামী বেঁচে আছেন, অথচ তাঁর কাছে যাবার উপায় নেই, তাঁর সংবাদ নেবার উপায় নেই, এমন কি, কোথায় কতদূরে কীভাবে যে তাঁকে আটক ক'রে রেখেছে দুষমণেরা, তা জানাবারও কোন উপায় নেই!—এ-রকম অসহায় অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে কি যে নিদারুণ যাতনা হয়, তা তিনি সেই দু'বছরে ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। মেয়েও যাতে বাপের জন্য ঐ-রকম যাতনা ভোগ করতে বাধ্য না হয়, তাই এ কৌশল তিনি করেছিলেন। কন্যা যাতে কোনদিন জানতে না পারে যে, তার পিতা জীবিত—ওকি! আপনি হাঁটু গেড়ে বসছেন কেন?

—আমায় দয়া করুন! সত্যি কথা বলুন আমায়! নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি আপনার কাছে—আপনি আমায় সত্য কথা বলুন— সকাতরে ব'লে উঠলো লুসী।

এ অবস্থায় কি যে করা যায়—বুঝতে না পেরে মিঃ লরী বললেন —বিপদে ফেললেন আপনি! আপনার অবস্থা দেখে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। মাথা গুলিয়ে গেলে কথা কইবো কি ক'রে?…নয় পেন্সকে নয় গুণ করলে কত হয় বলুন তো চট ক'রে? কুড়ি গিনিতে কত শিলিং হয়, হিসাব করে বলুন তো? এঃ!—আপনি গুলিয়ে দিলেন সব!

বলতে-বলতে মিঃ লরী লুসীকে তুলে সযত্নে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। লুসীর অস্থিরভাবটা ধীরে-ধীরে কমে আসতে লাগলো। মিঃ লরীও মাথা ঠিক ক'রে নিজের গল্প সুরু করলেন আবার।

—শুনুন তাহলে, কুমারী ম্যানেট। আপনার মা ঠিক এই ব্যবস্থাই করেছিলেন আপনার সম্বন্ধে। তারপর তিনি স্বর্গে গেলেন। ভগ্ন-হৃদয়ে মারা গেলেন বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার পিতার জন্য সন্ধানের তাঁর বিরাম ছিল না—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যাই

হোক, তিনি মারা গেলেন। আপনি বড় হয়ে উঠলেন দিনে-দিনে··· স্নুন্দরী, লাবণ্যময়ী, স্নুখী। আপনার পিতা বেঁচে আছেন, বেঁচেও মরার সামিল হয়েই আছেন, এ-কথা আপনি জানতে পারেননি কোনদিন। তা যদি পারতেন, তা হ'লে আপনার মায়ের মত আপনারও জীবন কাটত সংশয় আর যাতনার মাঝে। সে-যাতনার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন আপনি এতদিন—মায়ের আশীর্বাদে।

লুসীর সোনালী চুলের দিকে নতনেত্রে তাকিয়ে ছিলেন মিঃ লরী। তাঁর চোখের চাহনির ভিতর দিয়ে গভীর স্নেহ ঝ'রে পড়ছিল যেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—পিতার দুর্ভাগ্যের কথা গোড়া থেকে জানতে পারলে এই সতেরো বছরের মেয়েরই চুল হয়তো আজ সাদা হয়ে যেতো, যাতনার আগুনে পুড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ লরী বললেন—না, সম্পত্তির কোন কথা নয়, ও-সম্বন্ধে নতুন কোন খবর নেই। কিন্তু···

তাঁর একখানা হাত লুসীর হাতের ভিতরে বন্দী রয়েছে বহুক্ষণ, তার উপর যেন বড় বেশী চাপ পড়তে লাগলো এইবার। ওদিকে লুসীর দুই ভ্রূর মাঝখানের যে চিন্তারেখা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন তা যেন স্থায়ী আসন গেড়ে বসেই রইলো সেখানে। শুধু সেই রেখাটির দিকে তাকিয়েই মিঃ লরী বুঝতে পারলেন—কী ভয়ানক বেদনা আর বিভীষিকায় ভ'রে গেছে কোমলা কুমারীর অন্তর। লুসীর চেতনাই যেন আধা-আধি লোপ পেয়েছে ; মিঃ লরীর কথাগুলো সে শুনছে বটে, কিন্তু তার কোন অর্থ সে বুঝতে পারছে না।

মিঃ লরী বললেন—হাঁ, পাওয়া গেছে···তাঁকে পাওয়া গেছে···বেঁচে আছেন তিনি। খুবই বদলেছেন—অবশ্য। শরীর-মন একেবারেই ভেঙে গেছে বলে মনে হয়। অবশ্য, আশা করছি তিনি হয়তো ভালোই আছেন। অন্ততঃ বেঁচে যে আছেন, এটাও তো কম কথা নয়! ব্যাষ্টিল থেকে বেরুবার পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরই এক পুরাতন কর্মচারীর বাড়ীতে। আমরা সেখানেই যাবো এখন। আমি যাচ্ছি—দেখি তাঁকে চিনতে পারি কি না, অর্থাৎ ইনিই সত্যি-

সত্যি আপনার পিতা কি না, সেটা সনাক্ত করবার ভার আমার। আর, আপনার ভার—আপনার স্নেহে ও সেবায় ওঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা, জীবনের আনন্দ আর আশা ওঁকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া···

সারা দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল লুসীর। সে যেন স্বপ্নের ঘোরেই ব'লে উঠল—বাবা! আমার বাবা বেঁচে আছেন! তাঁকে আমি দেখতে পাবো?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে মিঃ লরী বললেন—আর একটা জিনিস মনে রাখা দরকার কুমারী ম্যানেট! প্যারীতে রাজার যে কারাগার আছে ব্যাষ্টিল,—নামে কারাগার মাত্র হ'লেও সবদিক দিয়ে একটা তুর্গের মতই যা মজবুত—সেইখানেই আপনার পিতাকে আটক রেখেছিল শত্রুরা। কে সে শত্রু, কেন সে আটক রেখেছিল তাঁকে —এ-সব বিষয়ে সন্ধান নিতে যাওয়া বিপজ্জনক হবে এখন। আমাদের কাজ হবে—ওঁকে যত শীঘ্র সম্ভব ফ্রান্স থেকে সরিয়ে আনা। দেখুন, আমি ইংরেজ। ইংলণ্ডের রাজার প্রজা আমি, তার উপর টেলসন-ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মচারী হিসেবে ফরাসীদেশে আমার কিছুটা সম্মানও আছে, কিন্তু ব্যাষ্টিলের কথা মুখে উচ্চারণ করতে ভয় পাই আমি।—কিন্তু! একি! মিস্ ম্যানেট।···লুসী।

লুসী স্থির হয়েই বসেছিল—কিন্তু মিঃ লরীর কথা শুনতে-শুনতে কখন চেতনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ভাগ্যহীনা বালিকার। চক্ষু তুটি বিস্ফারিত হয়ে লরীর মুখের দিকে তাকিয়েই আছে, তুই ভ্রূর মাঝখানটা তখনো আগের মতই 'কুঁচকে রয়েছে। সবই আগের মত আছে, নেই কেবল জ্ঞান। এমন শক্ত ক'রে লুসী মিঃ লরীর হাত তু'খানা ধরেছিল যে, তাঁর নড়বার উপায় ছিল না। নড়লেই লুসী মাটিতে প'ড়ে যাবে। সুতরাং সেইভাবে ব'সে ব'সেই মিঃ লরী হোটেলের দাসীদের ডাকতে লাগলেন—সাহায্যের জন্য।

দুই

ডিফার্জের দোকানে

প্যারী মহানগরীর এক গরিব পাড়া—সেণ্ট্ আণ্টইন। তারই এক রাস্তার ধারে ডিফার্জের মদের দোকান। দোকানের সামনে প্রকাণ্ড একটা মদের পিপে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। মদের স্রোত বইছে রাস্তায়। লাল মদে রাস্তাটা যেন রক্তনদী হয়ে গিয়েছে। অবশ্য, এমন দিনও এসেছিল হু'দিন পরেই, যখন সেণ্ট আণ্টইনের ঐ রাস্তা দিয়ে বাস্তবিকই বয়ে গিয়েছিল সত্যিকার রক্তের স্রোত। কিন্তু সে-কথা পরে।

আজ কিন্তু বিনা পয়সায় মদ খাওয়ার এই সুযোগ পেয়ে পল্লীর নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সবাই, তা আকণ্ঠ পান ক'রে নিচ্ছে। উঁচু-নীচু পাথরের রাস্তার ছোট-বড় গর্তগুলি মদের চৌবাচ্চায় পরিণত হয়েছে। তা থেকে আঁজলা ভ'রে-ভ'রে পান করেছে ওরা সাধ মিটিয়ে। কেউবা পেয়ালা ভর্তি ক'রে ঢালছে বালতির ভিতর, কেউ আবার রুমাল ভিজিয়ে তাই নিংড়ে দিচ্ছে শিশুর মুখে। একটা উৎসব চলেছে যেন পাড়ার ভিতর। ছুটোছুটি, হাসাহাসি,—নাচতেও সুরু করেছে কেউ-কেউ হাত ধরাধরি ক'রে।

দোকানের দোরে দাঁড়িয়ে ডিফার্জ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পাড়ার লোকদের এই মাতামাতি। পিপে ভেঙেছে, সেটা আড়তদারের লোকসান, ডিফার্জের নয়। তাই এত বড় লোকসান দেখেও সে বিচলিত হয় নি। সে বরং খুশীই হয়েছে এতে। পাড়ার গরিবেরা একটু আনন্দ পায় যদি তো পাক্ না। পয়সা দিয়ে খাবার মত অবস্থা তো ওদের নয়।

অবশেষে রাস্তার গর্তে মদ আর যখন রইলো না, সেই সময় আধা-মাতাল একটা নোংরা চেহারার লোক আঙুলের ডগায় একটু-খানি মদ লাগিয়ে পাশের বাড়ীর দেয়ালের গায়ে লিখলো—

"রক্ত! রক্ত!"

লেখাটা চোখে পড়া মাত্র ধীর শান্ত ডিফার্জ হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল সেখানে। হাতে করে কাদা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘসে দিলো ঐ লেখার উপরে। তারপর লেখকের জামার উপরে নিজের কাদা-মাখা হাতখানা মুছতে-মুছতে তিরস্কার ক'রে উঠলো— এ-সব রসিকতা করবার জায়গা কি রাস্তার উপরে, গ্যাস্পার্ড ? তোমায় দেখছি পাগলা-গারদে পাঠানোর দরকার !

গ্যাস্পার্ড হেসে ডিগবাজী খেতে-খেতে চলে গেল। ডিফার্জও ঢুকলো নিজের দোকানে। সেখানে ব'সে দোকানের তদ্বির করছে তার স্ত্রী মাদাম ডিফার্জ।

মাদাম ডিফার্জ সর্বদাই তার সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। চোখ তুলে চাইবার অবসর নেই কোনদিকে। সেই সেলাইয়ের দিকে মনোযোগ দিয়ে কেউ লক্ষ্য করতো যদি, চক্ষুস্থির হয়ে যেতো তার। নানা রঙের সুতোয় কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে শুধু নাম লেখা ! হাজারো নাম ! কাদের এ সব নাম, কে জানে তা !

স্বামীকে দেখে একটিবার মাত্র একটুখানি কাসতে শোনা গেল মাদাম ডিফার্জকে। স্বামীর মনে হলো—কেউ অপরিচিত ব্যক্তি এসেছে হয়তো, তা নইলে এমনভাবে অসময়ে কাসতো না তার স্ত্রী। সে খরিদ্দারদের ভিড়ের ভিতর মিশে গেল।

কেউ ব'সে আছে মদের গেলাস নিয়ে। কোথাও-বা দুই বন্ধু মিলে ডোমিনো খেলতে বসেছে। মাথা নেড়ে সবাইকে সম্ভাষণ জানালো ডিফার্জ, মাথা নেড়েই গ্রহণ করলো সবাইয়ের সম্ভাষণ। এক জায়গায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কথা বলছিলো, গেলাস হাতে নিয়ে।

একজন বলছিলো—রাস্তার মদটা বোধ হয় সবই উদরস্থ করেছে পাড়ার লোকে, কি বলো জ্যাক্‌স্ ?

ডিফার্জ উত্তর করলো—হ্যাঁ, আর এক ফোঁটাও নেই জ্যাক্‌স্ !

তিনমূর্তির ভিতর দ্বিতীয় বললো—কালো রুটি খেয়ে-খেয়েই

জীবন কাটে এদের ! মদ তো বড় একটা পায় না খেতে···কি বলো জ্যাক্স্ ?

ডিফার্জ উত্তর করলো—ঠিকই বলেছো জ্যাক্স্ !

তৃতীয় ব্যক্তি এবারে বললো—যা হোক তবু মুখ বদলাবার একটা সুযোগ পেলো আজ এই অভাগার দল। ঠিক কথা কি না···জ্যাক্স্ ?

ডিফার্জ উত্তর করলো—তা ঠিক বইকি, জ্যাক্স্।

তিন-তিনবার এই একই নামের আদান-প্রদান মাদাম ডিফার্জের মনোযোগ এড়ায়নি। প্রতিবারই ঈষৎ কুঁচকে উঠেছে তার ভ্রূ, আর, প্রতিবারই একটুখানি কেসেছে সে। ডিফার্জ তখন লোক তিনটিকে পরিচিত ক'রে দিলো তার স্ত্রীর সঙ্গে। মাদাম ডিফার্জ একটুখানি মাথা নামিয়ে গ্রহণ করলো তাদের নমস্কার, আর সঙ্গে-সঙ্গে চকিত দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলো একবার লোক তিনটিকে। তার সেলাই কিন্তু একটুও থামলো না, সমান ভাবেই চলতে লাগলো।

ডিফার্জ লোক তিনটিকে বললো—হ্যাঁ! যে ঘরখানা তোমরা দেখতে চাইছিলে, তা ছ'তলার উপর। সোজা উপরে উঠে গেলেই দেখতে পাবে।

মদের দাম চুকিয়ে দিয়ে ওরা উপরে উঠে গেল। ওরা চলে যেতেই একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পিছনের বেঞ্চ থেকে উঠে এসে ডিফার্জকে বললেন—আমি কি একটা কথা বলতে পারি ?

ডিফার্জ বললো—নিশ্চয় !

এক মিনিটের বেশী কথা হলো না। প্রথম শব্দটি শুনেই চমকে উঠেছিল ডিফার্জ, তারপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সে শুনলো ভদ্রলোকের কথাটি, শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দোকানের একদিকে বেঞ্চের উপর বছর-সতেরো বয়সের একটি তরুণী ব'সে ছিলেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিও বেরিয়ে গেলেন ডিফার্জের পিছনে-পিছনে। মাদাম ডিফার্জ তখন আপন মনে সেলাই ক'রে চলেছে···সে কিছুই দেখতে পেলো না বোধ হয়।

অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে। ধীরে-ধীরে ওঠাই ভালো !—

ডিফার্জ বেশ বিরক্ত সুরেই বললো কথাগুলো। তার পিছনে-পিছনে মিঃ লরী উঠছেন কুমারী ম্যানেটকে নিয়ে।

মিঃ লরী ফিস্-ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কি একা?

ডিফার্জ বললো—একা ছাড়া তাঁর কাছে কে থাকবে?

—সর্বদাই একা থাকেন তিনি?

—একা তো থাকেনই—তা ছাড়া সব সময় দরজা বন্ধ করে থাকেন ···দীর্ঘ দিন কারাগারের খুপরিতে বন্দী থাকতে-থাকতে তাঁর এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, খোলা দরজা তিনি সহ্য করতে পারেন না!

—কিছু পরিবর্তন হয় নি?

—যেদিন প্রথম ব্যাষ্টিলের লোক এসে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেল ওঁকে, সেদিন যে-রকম দেখেছি ওঁর অবস্থা, আজও অবিকল তেমনি।

—খুবই বদ্‌লে গেছেন কি তিনি?

—বদ্‌লে? ভয়ানক একটা অস্বাভাবিক স্বরে ডিফার্জ ব'লে উঠলো কথাটা; আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভীষণ শপথ উচ্চারণ ক'রে দেয়ালে মারলো একটা ঘুষি। মিঃ লরীর আর বুঝতে বাকী রইলো না—মসিয়েঁ ম্যানেটের পরিবর্তনের রকমটা কী সাংঘাতিক।

সিঁড়ির মাঝপথে তু'বার বিশ্রামের জন্য থেমে, অবশেষে ওঁরা এসে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুলেন। সেখান থেকেও আবার একটা সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো একটা চিলে কুঠুরিতে। তার দোর তালাবন্ধ। আর, দোরের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সেই তিনটি জ্যাক্স্, একটু আগে যাদের কথা কইতে দেখা গিয়েছিল ডিফার্জের সঙ্গে। ডিফার্জের পিছনে তু'জন অপরিচিত লোক দেখে ওরা তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে নেমে চলে গেল। মিঃ লরী রুষ্টভাবে ডিফার্জকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি লোক ডেকে-ডেকে আনো নাকি মসিয়েঁ ম্যানেটকে দেখবার জন্য?

ডিফার্জ উত্তর করলো—বিশেষ-বিশেষ লোককে আনি বৈকি ওঁর অবস্থা দেখবার জন্য।

—বিশেষ-বিশেষ? কী রকম?—প্রশ্ন করলেন মিঃ লরী।

—বিশেষ লোক, অর্থাৎ তাদের নাম হবে জ্যাক্‌স, আমারই মত। আপনি ইংরেজ, ওসব বুঝবেন না। ফরাসীদেশের পক্ষে কী যে এখন প্রয়োজন, তা আমার চেয়ে আপনার ভালো জানবার কথা নয়!—এই কথা বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে দরজার উপর জোরে-জোরে বার কয়েক আঘাত করলো ডিফার্জ। যেন, ঘরের ভিতরকার লোকটির মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় সে এইভাবে। তারপর সে তালা খুলে ফেললো। ঘরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে কী-যেন একটা কথা বললো সে। অতি ক্ষীণ স্বরে একটা উত্তরও শোনা গেল সে-কথার। মিঃ লরী প্রবেশ করলেন, লুসী ম্যানেটকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি তাকে শক্ত ক'রে ধ'রে রেখেছিলেন, নইলে লুসীর পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবই হতো না হয়তো।

লুসী বললো—আমার ভয় করছে!

মিঃ লরী বললেন—ভয় কি? কিসের ভয়?

লুসী কানে-কানে বলে—কি জানি, কি দেখবো।

ঘরখানা একেবারে ছোট এবং অন্ধকার। এক দিকের একটা জানলা দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে ভিতরে। ভালো ক'রে জানলা খুলে দিলে আরও আলো আসতে পারতো অবশ্য, কিন্তু তা খোলা হয় নি। হয়তো এ-ঘরের অধিবাসীর চোখে বেশী আলো সহ্য হয় না বলেই।

সেই সামান্য আলোতে একখানা নীচু বেঞ্চিতে ব'সে এক পক্ককেশ বৃদ্ধ আপন মনে জুতো সেলাই করছে।

ডিফার্জ বললো—সুপ্রভাত!

বৃদ্ধের মাথাটা এক সেকেণ্ডের জন্য একটুখানি উঁচু হলো, তারপর তার অতি ক্ষীণস্বর ভেসে এলো যেন অতি দূর থেকে—সুপ্রভাত!

—খুবই পরিশ্রম করছেন তো?—বললো ডিফার্জ।

অনেকক্ষণ কোন উত্তর নাই। অবশেষে আর-একবার সেই নত-মস্তক উঁচু হলো—এক সেকেণ্ডের জন্য, এবং সেই স্বর আবার শোনা

গেল—হ্যাঁ, আমি কাজ করছি! এবারে হু'টি ঘোলাটে কোটরগত চক্ষু এক মুহূর্তের জন্য চেয়ে দেখলো—ডিফার্জের দিকে। তারপরে আবার নুয়ে পড়লো জুতো সেলাইয়ের উপর।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ডিফার্জ বললো—আর একটু বেশী ক'রে খুলে দিতে চাই এই জানলাটা, বেশী আলোতে আপনার অসুবিধে হবে কি?

—কী বলছো?

—আর একটু আলো সহ্য করতে পারবেন কি?

—আলো আনো যদি, আমায় সহ্য করতেই হবে!—শেষ হু'টি কথার উপরে আপনা থেকেই যে জোর পড়লো একটু, তা বোধ হয় বৃদ্ধ বুঝতেই পারলেন না। জানলাটা আর-একটু বেশী ক'রে খুলে দিলো ডিফার্জ। অমনি জোরালো আলোর ঝলকে ঘর ভরে উঠলো। সেই আলোয় এইবার গৃহের বাসিন্দাটিকে বেশ ভালো ভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হলো। অর্ধেকটা-সেলাই-করা একটা জুতো কোলে নিয়ে তিনি ব'সে আছেন। বেশী আলো তিনি অনেকদিন চোখে দেখেন নি। হঠাৎ সেই বেশী-আলোর ভিতর প'ড়ে তাঁর চোখ জ্বালা করছিল বোধ হয়, তাই একখানা হাত আড়াল ক'রে ধরেছেন চোখের উপর। জুতো-সেলাইয়ের কিছু যন্ত্রপাতি এবং কয়েক টুক্‌রো চামড়া প'ড়ে আছে তাঁর পায়ের কাছে। সাদা দাড়ি যেমন-তেমন ক'রে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। শীর্ণ কপালের নীচে অতিরিক্ত রকম বড় হুটো চোখ। একে তো সে চোখ স্বভাবতঃই বড়, তার উপর মুখের শীর্ণতা আর মাথার এলোমেলো চুলের রাশ—এ-হুয়ের দরুন আরো বেশী বড়ো দেখাচ্ছে। জামা-কাপড় শত জায়গায় ছেঁড়া। সার্টের গলা খোলা; তার নীচে থেকে বুকের হাড়-পাঁজর গুনে নেওয়া যায়। তাঁর গায়ের চামড়া, পরিধানের কাপড়, পায়ের মোজা—এ-সবেতে রৌদ্র বাতাস লাগেনি বহুদিন; সবই বিশ্রী রকমের নোংরা আর হলদে হয়ে গেছে—কোন্‌টা চামড়া আর কোন্‌টা কাপড়—তা চিনে বার করা শক্ত।

যে-হাতখানি দিয়ে আলো আড়াল করেছিলেন বৃদ্ধ, তার হাড়

পর্যন্ত যেন স্বচ্ছ দেখাচ্ছিলো সেই আলোর ভিতর। কাজ বন্ধ ক'রে একদম চুপচাপ তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি তাঁর চোখে। কথা শুনলে কোনদিকে তাকাতে হবে, তা যেন হঠাৎ ঠাহর পান্‌না তিনি! একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে চোখ ফিরিয়ে খুঁজতে থাকেন—শব্দটা এলো কোথা থেকে!

ডিফার্জ বললো—আপনি কি ঐ জুতো জোড়া আজই শেষ করতে চান?—প্রশ্ন করেই সে মিঃ লরীকে ইসারা করলো কাছে আসবার জন্য।

—কী বললে তুমি?

—জুতোটা কি আজই শেষ করতে চান?

—না, শেষ করতেই চাই—এমন কিছু নয়। তবে হয়ে যেতে পারে।—এই ব'লে তিনি আবার কাজে হাত দিলেন।

মিঃ লরী ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলেন। কুমারী ম্যানেট দরজার পাশেই অপেক্ষা করতে লাগলো। মিঃ লরী ডিফার্জের পাশে এসে দাঁড়াবার মিনিট-দুই পরে বৃদ্ধ আবার মুখ তুলে চাইলেন। একজন লোকের জায়গায় দু'জন দেখেও কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলেন না তিনি, একবার কেবল তাঁর হাতের আঙুল উঠলো গিয়ে ঠোঁটের কাছে। আঙুল এবং ঠোঁট দুই-ই বর্ণহীন ফ্যাকাসে।

ডিফার্জ বললো—আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

—কী বললে?

—একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

জুতোর উপর থেকে চোখ একবার উপরে উঠলো বটে, এক-পলকের জন্য, হাত কিন্তু কাজ করতেই থাকলো।

ডিফার্জ বললো—জুতোটা ভদ্রলোককে দেখান না! ঠিক হচ্ছে কি না, বলতে পারবেন ইনি! এই ব'লেই সে জুতোটা তুলে নিয়ে লরীর হাতে দিয়ে আবার বললো—এ জুতোটা কী জুতো, বলুন না ভদ্রলোককে!

এবারে একেবারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধ নীরব, তারপর উত্তর হলো —কী তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, ভুলে যাচ্ছি আমি।···কী বলছিলে?

—আমি বলছিলাম—এ জুতোটা কী জুতো, বলুন না এঁকে!

—এটা মেয়েদের জুতো। তরুণীদের বেড়াবার জুতো, আজকালকার ফ্যাশান এইরকমই। ও ফ্যাশান আমি কখনো চোখে দেখিনি, তবে একটা নমুনা দেখেছিলাম।

ডিফার্জ বললো—যিনি তৈরী করছিলেন, তাঁর নামও জানতে চান এই ভদ্রলোক।

হাতে জুতো নেই, একবার ডান হাতের কব্জি বাঁ হাতে, এবং বাঁ হাতের কব্জি ডান হাতে নিয়ে যেন নাড়ী টিপতে লাগলেন বৃদ্ধ। তারপর গালের দাড়িতে বুলোতে লাগলেন হাত···এক মুহূর্ত বিরাম নেই তার। মনটা ভ'রে আছে আঁধারে, দীর্ঘ দিনের জমাট আঁধার। ডিফার্জের কথা বিজলীর ঝিলিকের মত সে-আঁধার এক একবার চিরে দিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু পরের মুহূর্তেই সারা অন্তর আগের মতই জমাট অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে আবার। তাকে সেখান থেকে তুলে আনা সহজ নয়। দুর্বল রোগী যখন মূর্ছা যায়, তখন তার চেতনা ফিরিয়ে আনা শক্ত। যে লোক মরতে বসেছে, সংসারের খুঁটিনাটির ব্যাপারে তার আগ্রহ ক্ষণিকের জন্য জাগিয়ে তোলা আরও শক্ত। কিন্তু ও-সবের চাইতেও বুঝি শক্ত এই সব-ভুলে-যাওয়া বৃদ্ধের মনে স্মৃতি জাগিয়ে তোলা। অন্ততঃ মিঃ লরীর ত তাই মনে হ'ল।

কিন্তু যতই শক্ত হ'ক, সেই চেষ্টাই তবু করতে হবে এখন ডিফার্জ, মিঃ লরী আর লুসী ম্যানেটকে।

ডিফার্জ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—ভদ্রলোকেরা আপনার নামটা জানতে চাইছেন।

বৃদ্ধ নীরব। ডিফার্জ তখন আবার জিজ্ঞাসা করে।

—আমার নাম···আমার নাম হলো ১০৫, নর্থ টাওয়ার।

—সে কি!

—হ্যাঁ···১০৫, নর্থ টাওয়ার।

একটা ক্লান্তির শব্দ। দীর্ঘশ্বাস নয়, কাতর কোন উক্তি নয়! দেহ মন যে একটা দারুণ ক্লান্তির ভারে ভেঙে পড়েছে, বাইরে তারই একটুকুন একটা প্রকাশ ছোট্ট একটা অস্পষ্ট শব্দের ভিতর দিয়ে! শব্দটা বেরুলো মুখ থেকে। তারপরই আবার কাজ সুরু। কিন্তু তাঁর মনোযোগ আবার ভঙ্গ হলো, এবারে ডিফার্জের কথা নয়, প্রশ্ন এলো মিঃ লরীর কাছ থেকে।

—আপনি কি চিরদিনই জুতো তৈরী করছেন?

ঘোলাটে ছুটো চোখ একবার তাকালো ডিফার্জের দিকে, যেন ডিফার্জকে বলতে চায়—এ প্রশ্নের উত্তর তুমি দাও। কিন্তু ডিফার্জ নীরব। তখন বৃদ্ধের দৃষ্টি মিঃ লরীর দিকে ফিরলো।

—আমি চিরদিন জুতো তৈরী করছি কি না? না, তা করিনি। এ আমি এখানেই শিখেছি। নিজে-নিজেই শিখেছি। শিখবার অনুমতি অবশ্য নিয়েছিলাম আমি—

বলতে-বলতেই আবার ডান হাতে বাঁ হাতের কব্জি, বাঁ হাতের ভিতর ডান হাতের কব্জি—আর দাড়িতে হাত বুলোনো। তারপর দৃষ্টি আবার পড়লো এসে মিঃ লরীর মুখের উপর। এক-পলক সে মুখখানি দেখে নিয়ে হঠাৎই যেন চমকে উঠলেন বৃদ্ধ, মনে প'ড়ে গেল মিঃ লরীর প্রশ্ন, আর সে-প্রশ্নের উত্তর দিতে-দিতে তাঁর থেমে যাওয়া। কী-যেন গল্প তিনি রাত্রি বেলা বলতে সুরু করেছিলেন; বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর জেগে উঠলেন ভোরবেলায়, আর জেগে উঠেই সেই আর্দ্ধেক-বলা গল্পের খেই ধ'রে নতুন ক'রে বলতে সুরু করলেন—

—হ্যাঁ, আমি অনুমতি নিয়ে নিজে-নিজেই শিখেছি এটা। অনেক দিনের চেষ্টায় একটু-একটু ক'রে শিখতে হয়েছে। তারপর থেকে বরাবরই করছি এই কাজ।—এই ব'লে বৃদ্ধ মিঃ লরীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। একখানা জুতো তখনও মিঃ লরীর হাতেই রয়েছে। সেখানা ফিরে পাওয়ার জন্যই হাত বাড়ান। জুতো ফেরত দিয়ে মিঃ লরী বললেন ঃ

মসিয়েঁ ম্যানেট! আমায় কি একটুও মনে পড়ে না আপনার?

হাতের জুতো হাত থেকে প'ড়ে গেল বৃদ্ধের। প্রশ্নকর্তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ব'সে রইলেন তিনি।

ডিফার্জ তাঁর হাতের উপর হাত রেখে বললো—মসিয়েঁ ম্যানেট, এই লোকটির কথা কি কিছুই মনে পড়ে না আপনার? ওঁকে দেখুন ভাল করে! কোন ব্যাঙ্কারকে চিনতেন কি আপনি পুরোনো দিনে? কোন ব্যবসাকর্মের কথা মনে পড়ে—আগেকার পুরোনো দিনের? আপনার কোন আত্মীয়-স্বজনের কথা?

বহু, বহু বৎসরের নির্জন কারাকক্ষের বন্দী নীরবে স্থির নয়নে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেন—একবার ডিফার্জকে, আর একবার মিঃ লরীকে—তাঁর স্মৃতিকে আড়াল করে, যে কালো কুয়াশার পর্দা ঝুলছে আজ বহু বৎসর ধ'রে, তা যেন হঠাৎ কোথায় একটুখানি ফাঁক হয়ে যায় এক লহমার জন্য। বহুদিনের মুছে-যাওয়া, নিবে-যাওয়া চেতনার ঝিলিক যেন কপালের মাঝখান থেকে একবার এক-মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠলো চকিত দীপ্তি নিয়ে। তারপরই সে আলোর উপর ঘনিয়ে এলো আবার বিস্মৃতির কালো মেঘ! ম্লান হয়ে গেল স্মৃতির সে ক্ষণিক আলো,—নিবে গেল, মুছে গেল তা একেবারে। গেল বটে, কিন্তু সে যে এসেছিল—তাতে সন্দেহ নেই। মিঃ লরীর আর কোন সন্দেহ নেই যে, ইনিই ডাক্তার ম্যানেট।

ডিফার্জ ফিস-ফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কি চিনতে পেরেছেন ওঁকে?

—হ্যাঁ। এক মুহূর্তের জন্য। আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, কিন্তু অবশেষে পেয়েছি দেখতে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও, পেয়েছি দেখতে সেই অতি-পরিচিত মুখখানি। ইনিই ডাক্তার ম্যানেট!

সহসা কিন্তু তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ডিফার্জকে টেনে নিয়ে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড়ালেন সরে গিয়ে। লুসী ম্যানেট এসে চুপি-চুপি দাঁড়ালো তার হতভাগ্য কবর-থেকে-ফিরে-পাওয়া পিতার পাশে।

হাত বাড়ালে লুসীর হাত স্পর্শ করতে পারতো ম্যানেটের মাথা। তবু ম্যানেট একেবারেই জানতে পারেননি লুসীর উপস্থিতির কথা। নীরবে তিনি ঝুঁকে পড়েছেন সেলাইয়ের উপরে।

হঠাৎ বৃদ্ধের দরকার হলো ছুরি। ছুরি খুঁজবার জন্য একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে তাকাতে লাগলেন তিনি। ও কি দেখা যায় এত কাছে? চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। তিনি লুসীর বসনের একাংশ দেখতে পেয়েছেন!

হাতে ছুরি, চোখে পাগলের মত দৃষ্টি নিয়ে যে-ভাবে লুসীর পানে চাইতে লাগলেন বৃদ্ধ ম্যানেট, তাতে ডিফার্জ আর লরী ভয় পেয়ে ছুটে আসবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই বুঝি হতভাগ্য উন্মাদ দেয় ওর বুকে ছুরি বসিয়ে! ভয়ে বুঝি লুসী অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু না, লুসীর আজ আর ভয় নেই। সে মিঃ লরী আর ডিফার্জের মতলব বুঝতে পেরেছে। সে হাত নেড়ে নিবারণ করলো ওঁদের। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে নিজের হস্ত চুম্বন করতে লাগলো সে, বারবার দুই হাত এনে বুকের উপর জড়িয়ে ধরতে লাগলো, যেন বৃদ্ধ পিতার শুষ্ক শিরই সে জড়িয়ে ধরেছে নিজের স্নেহকোমল বুকের উপরে। তার সে করুণ দৃষ্টির অর্থ পাগলের পক্ষেও ভুল বোঝা বা না-বোঝা অসম্ভব। কোন স্নেহের সম্ভাষণ তার মুখ থেকে উচ্চারিত না হ'লেও তার দু'টি ওষ্ঠ যেভাবে ফুলে ফুলে উঠছিল, তাতে পাগলকেও বুঝি বিচলিত হ'তে হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে লুসীর দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—

—তুমি—তুমি তো কারাধ্যক্ষের মেয়ে নও!

লুসী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—না।

—কে তুমি তবে?

লুসীর সারা দেহ আবেগে কাঁপছিল···কথা বলবার শক্তি যেন তার ছিল না। কোন উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে সে বৃদ্ধের পাশে বসলো। বেঞ্চের উপরে। ভয়ে সংকোচে সরে যেতে চান বৃদ্ধ, কিন্তু লুসী বৃদ্ধের হাতের উপরে রাখলো নিজের হাত। সে-স্পর্শে

হঠাৎ আশ্চর্যভাবে শিউরে উঠলো বৃদ্ধের সারা অঙ্গ, ধীরে হাতের ছুরি তিনি নামিয়ে রাখলেন পায়ের কাছে, তারপর বিস্মিত তৃষিত দৃষ্টি নিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন এই মমতাময়ী তরুণীর দিকে।

সোনালী রঙের এলো-চুল ছড়িয়ে পড়েছিল লুসীর কাঁধের উপর। একটু-একটু ক'রে বৃদ্ধের হাত এগিয়ে যেতে লাগলো সেই দিকে। এক-গোছা চুল হাতে তুলে নিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগলেন যেন!

আর থাকতে না পেরে লুসী নিজের কোমল উষ্ণ হাত দু'খানি তুলে দিলো বৃদ্ধের কণ্ঠে। বৃদ্ধ সেদিকে বারবার তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেন। তারপর নিজের গলা থেকে খুলে নিলেন—নোংরা সূতায় ঝোলানো একটা ততোধিক নোংরা ছোট্ট পুঁটুলি। খুলতে লাগলেন সেই পুঁটুলি ধীরে-ধীরে কম্পিত হস্তে।

তার ভিতর থেকে বেরুলো একগাছা লম্বা চুল, লুসীর চুলের মতই উজ্জ্বল সোনালী, লুসীর চুলের মতই মসৃণ চিক্কণ! হারিয়ে গেছে তাঁর যে অতীত জীবন, তারই এক কণা অবশেষ এই একগাছি চুল। সংসার গেছে, সম্পদ গেছে, ঘর গেছে, ঘরনী গেছে, শুধু হারিয়ে-যাওয়া সেই ঘরনীর একগাছি সোনালী চুল যায় নি শুধু তাই।

একবার সেই একগাছি সোনালী চুল, আর একবার লুসীর মাথার সোনালী চুলের গোছার দিকে বৃদ্ধ বারবার আকুল দৃষ্টিতে চান। তাঁর মনের ভেতর অকস্মাৎ জেগে ওঠে স্মৃতির ক্ষীণ আলো। চীৎকার করে ওঠেন—এ তো সেই একই চুল! কী করে হলো? কেমন করে? কেমন করে? কখন? কী এ-সব?

বৃদ্ধ সোজা উঠে দাঁড়িয়ে লুসীর মুখটা তুলে ধরে বলেন—কে তুমি? তুমি…তুমি কি সেই?

হাঁটু গেড়ে বৃদ্ধের সমুখে ব'সে পড়লো লুসী। আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠলো—আমি তোমার মেয়ে, তোমার মেয়ে। বাবা! বাবা! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি!

বৃদ্ধের দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অবিরল চোখের জল।

তিন

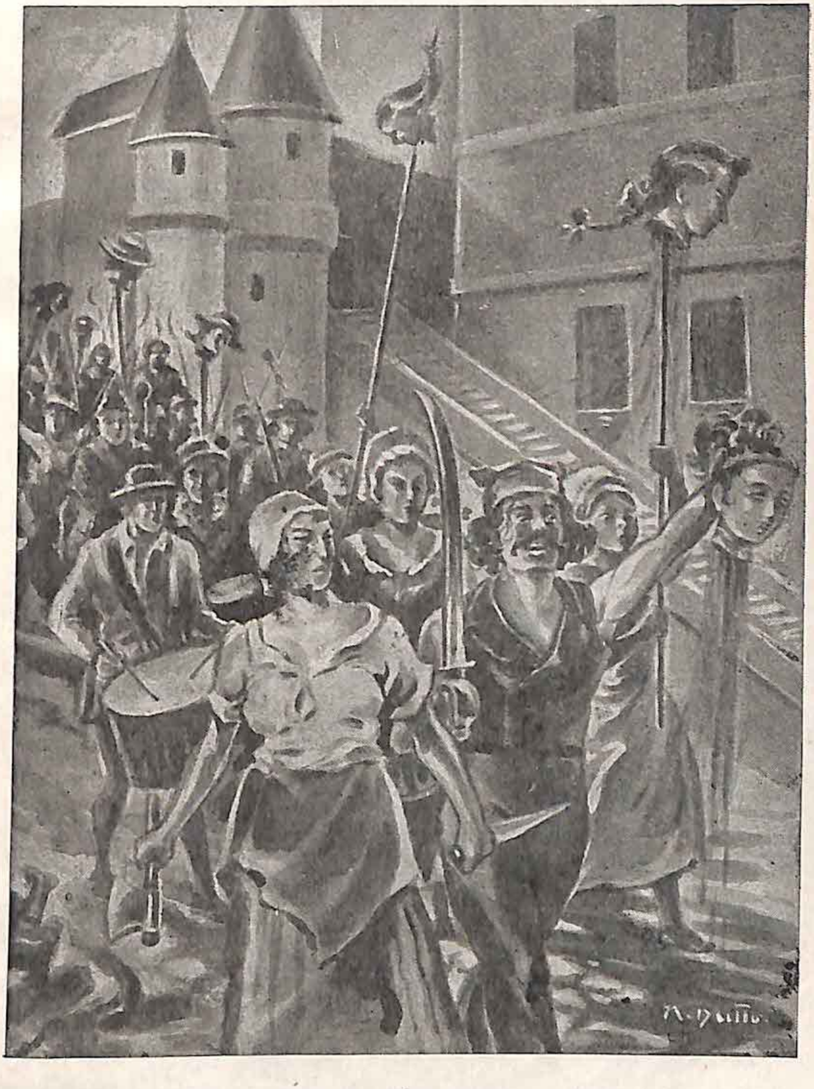
রাজদ্রোহের মামলা

পাঁচ বৎসর পরে।

লণ্ডনের ফৌজদারী আদালত—ওল্ড বেইলী।

লোকে লোকারণ্য, আজ একটা রাজদ্রোহের মামলা চলেছে। খুব সম্ভব, জুরীরা দোষীই সাব্যস্ত করবেন আসামীটাকে। জুরীরা সাধারণতঃ তাই করে থাকেন, রাজদ্রোহের মামলা পেলে। রাজার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে তো ভদ্রলোকদের! তাছাড়া, মাঝে মাঝে ফাঁসীটা-আস্‌টা নাগরিকদের দেখবার স্থযোগ দেওয়াও দরকার বই কি! নইলে, তারা টেক্সো দেয় কিসের জন্য?

তার উপর, রাজদ্রোহের আসামীর যা দণ্ড, তা শুধু ফাঁসীর মত নিরামিষ নয়। প্রথম অবশ্য ফাঁসীতেই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাণটা বেরিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে নামিয়ে ফেলতে হবে তাকে। তারপর গলার দড়ি খুলে নিয়ে তা দিয়ে বাঁধতে হবে হাত-পা। সেই অবস্থায় তাকে শুইয়ে রেখে, পেট ফেড়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলা হবে তার। সে নাড়িভুঁড়ি তার সমুখেই পোড়ানো হবে আগুন জ্বেলে। এদিকে জ্ঞান থাকতে-থাকতেই অনেক-কিছু করতে হবে তাকে নিয়ে। দেরী করা চলে না। এক-একখানি হাত, এক-একখানা পা ধীরে-সুস্থে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটা হবে তরোয়াল দিয়ে। কখনও কখনও তরোয়াল ব্যবহার না করে, ঘোড়ার পেছন-পায়ের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় হাত-পা। পরস্পরের বিপরীত-দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে দু'টো তেজী ঘোড়া। একটার পেছন-পায়ে বাঁধা হলো আসামীর হাত, আর-একটার পেছন-পায়ে তার পা দু'খানা। তারপর দু'টো ঘোড়াকেই মারা হলো জোরসে চাবুক। তারা ছুটলো বায়ুবেগে। অপরাধীর হাত ছিঁড়ে ছুটে চললো উত্তর দিকে, পা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল দক্ষিণে। কী স্বর্গীয় উল্লাস দর্শকদের! এরকম মজা কি পয়সা দিয়েও সার্কাসে দেখা যায়? সুসভ্য ইংরেজ-



জনসমুদ্রের মাথার উপর উঁচু-বাঁশে বসানো সাতটি ছিন্ন নরমুণ্ড!
মুণ্ডগুলি নিহত সপ্ত রাজকর্ম্মচারীর...:

গবর্ণমেন্ট দেড়শো বছর আগেও নাগরিকদের আনন্দের জন্য এ-রকম সব মনোরম ব্যবস্থা রেখেছিলেন আইনে। এই অল্প কয়েক দিনেই অনেক অধঃপতন হয়েছে দেশটার, উঠে গেছে সে-সব কানুন···

যাই হোক, হাত-পা কেটে বা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার পরেও প্রাণ বলতে যদি কিছু অবশেষ থাকে আসামীর দেহে, তবে তার অবসান করবার জন্য এইবার গলায় এক ঘা তলোয়ার বা কুড়াল বসানোর জন্য জল্লাদকে ডাকা হয় চট্‌পট্‌। আজকের আসামীটাকে দেখলে তো বেশ ভালো বলেই মনে হয়। দিব্য ভদ্রলোকের মত চেহারা, বছর-পঁচিশ বয়স হবে, বেশ পুষ্ট নধর দেহ, পোশাক সাধারণ হলেও পরিচ্ছন্ন। বর্তমান বিপদের জন্য মুখটা বিবর্ণ, কিন্তু কোনরকম চাঞ্চল্যের পরিচয় নেই তার ভাবভঙ্গীর ভিতর। বেশ গম্ভীর সংযত ভাবেই সে নমস্কার করলো জজ ও জুরী মহোদয়গণকে।

আসামীর উকিল একগোছা কাগজ নিয়ে ক্রমাগত নাড়া-চাড়া করছেন। আর, তাঁর কাছেই আর-একটি পরচুলা-পরা (তখন সব উকিলই পরচুল পরতেন) উকিল বসে-বসে ছাদের কড়িকাঠ গুনছেন। সরকারী উকিল সওয়াল সুরু করলেন।

"কয়েক বৎসর থেকেই আসামী চার্লস ডার্ণে ক্রমাগত ইংলিশ-চ্যানেল পারাপার করছে। কী এত প্রয়োজন তার ফ্রান্সে? কেন যায় সে ঘন-ঘন ও-দেশে? খুব সন্দেহজনক নয় কি তার গতিবিধি?

জন্ বর্‌সাদ হলো ঐ ডার্ণেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। "হলো" না বলে, "ছিল" বলাই উচিত বোধ হয়। কারণ, আসামীর জঘন্য আচরণের যা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তাতে সাক্ষী মিঃ বর্‌সাদের মত মহানুভব দেশপ্রেমিকের পক্ষে তাকে আর বন্ধু বলে মনে করা সম্ভব নয়। আসামীর জঘন্য আচরণের পরিচয় প্রথমে এই মিঃ বর্‌সাদই পান, এবং নিছক দেশপ্রেমের তাগিদেই তাঁকে প্রকাশ করে দিতে হয়েছে উক্ত জঘন্য আচরণের কথা। জঘন্য আচরণটা কি?—না, ডার্ণে গুপ্তচর। মহা-মহিমান্বিত সদাশয় সর্বগুণান্বিত

ইংলণ্ডাধিপ শ্রীল তৃতীয় জর্জের সৈন্যবাহিনীতে কত সৈন্য আছে, সে সব সৈন্য কোথায় কোথায় আছে, কী কী অস্ত্রে তারা শিক্ষালাভ করছে—এই সব গুরুতর বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদ যে কোন উপায়ে সংগ্রহ ক'রে, তাই ফরাসীরাজ লুইয়ের দরবারে পেশ করাই হলো তার পেশা। ঐসব সংবাদ সরবরাহ করতে তাকে নিজের চোখে দেখেছেন দেশপ্রেমিক বর্‌সাদ। আসামী ঐসব বিবরণ যে কাগজপত্রে লিখে রেখেছিল, তা তার পকেটে ও টেবিলের দেরাজে পাওয়া গিয়েছে, পেয়েছে তারই ভৃত্য। উক্ত ভৃত্যও—তার গুপ্তচর-প্রভুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছে ; এসেছে দেশপ্রেমেরই তাগিদে।"

সওয়াল শেষ করে সরকারী উকিল বর্‌সাদ, এবং রোজার ক্লাইয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। বর্‌সাদ ছিল ডার্ণের বন্ধু, ক্লাই ছিল তার ভৃত্য। উকিল পূর্বেই যা বলে রেখেছেন, সাক্ষীরা পরে এসে বললো সেই কথাই। তবে জেরাতে ও-ছাড়াও ছু'চারটে নতুন কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো। বর্‌সাদের মুখ থেকে যা শোনা গেল তা কতকটা এই রকম :

—তুমি নিজে কোনদিন গুপ্তচর ছিলে ?

—না। ও-রকম বদনাম যে দেয়, তাকে ঘৃণা করি আমি।

—কিসে চলে তোমার ?

—সম্পত্তি আছে, মশাই !

—সম্পত্তিটা কোথায় ?

—সেটা—সেটা ঠিক মনে পড়ছে না চট্ করে।

—সম্পত্তিটা কী ?

—তাতে অন্যের কি প্রয়োজন, মশাই ?

—সম্পত্তিটা কারও কাছ থেকে পাওয়া বোধ হয় ?

—হ্যাঁ, তা বই কি।

—কার কাছ থেকে ?

—দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল একজন—

—খুবই দূর—বোধ হয় ?

—তা, দূরই বটে !

—জেলে গিয়েছিলে কখনো ?

—নিশ্চয়ই না।

—দেওয়ানী জেলে ? দেনার দরুন ?

—এ-মামলার সঙ্গে সে-কথার সম্বন্ধ কী, তা ত' বুঝতে পারছি না।

—আবারও বলছি, দেওয়ানী জেলে গিয়েছিলে ? উত্তর দাও !

—তা, হ্যাঁ—

—কতবার ?

—দু'তিনবার হবে।

—না—পাঁচ-ছ'বার।

—তাও হতে পারে হয়তো !

—পেশা কি ?

—ভদ্রলোক ! ভদ্রলোকের আবার পেশা কি ?

—লাথি খেয়েছো কখনো ? কারো কাছে ?

—তা—হয়তো—

—বহুবার ?

—না, না !

—লাথি মেরে সিঁড়ির ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল কেউ ?

—না, না ! সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ-ই লাথিটা পড়লো এসে ! টাল সামলাতে না পেরে নিজেই পড়ে যাই !

—লাথি খেয়েছিলে, জোচ্চুরির দরুন ত' ?

—বলেছিল বটে সেই মিথ্যুক লোকটা। কিন্তু ওটা মিছে কথা ! লোকটা মাতাল ছিল তখন !

—যদি বলি, জোচ্চুরিই তোমার পেশা ? তাই করেই দিন চলে তোমার ?

—কখনো না।

—আসামীর কাছে টাকা ধার করেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—সে টাকা শোধ দিয়েছিলে ?

—না।

—আসামীর সঙ্গে যে বন্ধুত্বের কথা তুলেছো, সেটা কী রকম বন্ধুত্ব ? তুমিই গায়ে প'ড়ে প'ড়ে খানিকটা আলাপ-পরিচয় জমিয়েছিলে, কী বলো ? গাড়ীতে, ষ্টীমারে, হোটেলে এবং রাস্তায়ই যা-কিছু আলাপ—কী বলো ?

—না, তা হবে কেন ?

—তুমি গবর্ণমেণ্টের মাইনে-করা গোয়েন্দা কি ?

—বলেন কি মশাই ?

—এই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার দরুন বকশিশ পাবে কিছু ?

—আরে বলেন কি মশাই ?

—ভগবানের নামে দিব্যি করে বলতে পারো এ-কথা ?

—লক্ষ বার !

আসামীর কোন এক সময়ের ভৃত্য রোজার ক্লাইকে সরকারী উকিল খুব জোর সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। সে নাকি কর্তব্যের জন্য সবই করতে পারে। সে নাকি উঁচুদরের দেশপ্রেমিক। জবানবন্দীতে সে বলেছিল—আসামীর পকেটে সে লম্বা-লম্বা তালিকা দেখতে পেতো প্রায়ই। ক্যালে বন্দরে একদিন আসামী এই ধরনের কয়েকখানা তালিকা দিয়েছিল এক ফরাসী ভদ্রলোককে। এসব তালিকায় প্রায়ই যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের কথা থাকত, যুদ্ধের সময় কোন্‌খানে ঘাঁটি করলে ভাল হবে, কোন্ জায়গা সকলের আগে দখল করবার দরকার হবে, এসব কথারই উল্লেখ দেখা যেত। সাক্ষী যখন বুঝতে পারল যে তার প্রভু গুপ্তচর, তখন আর তার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হলো না। দেশপ্রেমের প্রেরণায় সে গবর্ণমেণ্টের কাছে এসে প্রকাশ করতে বাধ্য হলো তার প্রভুর জঘন্য বৃত্তির কথা। সে এক নম্বর সাক্ষীকে চেনে। জন বর্‌সাদ নাম তার। প্রায় সাত-আট বৎসর থেকে চেনে।

জেরার মুখে ক্লাই প্রকাশ করে ফেললো—সে যেচে এসে আসামীর কাছে চাকরীতে ভর্তি হয়েছিল, এক ষ্টীমারের উপরে! কষ্টে পড়েছে, খেতে পাচ্ছে না—ইত্যাদি বলেই সে আসামীর দয়া লাভ করেছিল। তারপর সে একটা রূপোর টি-পট চুরি করে।

তৃতীয় সাক্ষী হলেন মিষ্টার জার্ভিস্ লরী।

সরকারী উকিলের সঙ্গে তাঁর এইরকম প্রশ্নোত্তর হলো ঃ

—মিষ্টার লরী, আপনি টেলসন ব্যাঙ্কের কর্মচারী?

—হ্যাঁ।

—১৭৭৫ সালের নভেম্বরে এক শুক্রবার রাত্রে ডোভার-মেলে যাত্রী ছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ।

—ডাকগাড়ীতে আর যাত্রী ছিল?

—তু'জন ছিল।

—তারা রাত্রির ভিতরেই রাস্তায় নেমে গিয়েছিল?

—গিয়েছিল।

—এই আসামী কি সেই তু'জনের ভিতর একজন? দেখে বলুন।

—বলা সম্ভব নয়। তারা তু'জনেই এভাবে কাপড়-চোপড়ে ঢাকা ছিল, আর রাত্রি ছিল এমন অন্ধকার যে, কারো মুখ বা আকৃতি কিছু মাত্র দেখতে পাইনি আমি।

—এ আসামীর সঙ্গে তাদের কারও কোন সাদৃশ্য ছিল না, এমন কথাও ত' জোর করে বলতে পারেন না আপনি?

—তা পারি না।

—তাহ'লে এমনও হতে পারে যে, এ লোকটি ছিল সেদিন সে-গাড়ীতে?

—তা হতেও পারে।

—এ আসামীকে আপনি দেখেছেন আগে?

—দেখেছি!

—কবে?

—ক্যালে থেকে আসবার সময়ে ষ্টীমারে। উনিও আসছিলেন।

—ক'টার সময়ে ষ্টীমারে উঠেছিল আসামী ?

—রাত্রি বারোটার একটু পরে।

—অর্থাৎ, নিশুতি রাতে। ও-সময়ে আর কেউ এসেছিল ?

—না। উনি একাই এসেছিলেন।

—আপনি কি একা ভ্রমণ করছিলেন ?

—আমার সঙ্গে দু'জন ছিলেন আরও। এক তরুণী মহিলা, এবং এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন।

—ঐ সময় আসামীর সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল আপনার ?

—বিশেষ কিছু নয়।

সরকারী উকিল ডাকলেন—মিস ম্যানেট !

তরুণী মহিলাটি নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর পিতার পাশে। সেইখানেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পিতাও দাঁড়ালেন।

—কুমারী ম্যানেট ! এই আসামীকে পূর্বে দেখেছেন কখনো ?

—দেখেছি। যে ষ্টীমারের কথা আগের সাক্ষী এইমাত্র বললেন—সেই ষ্টীমারেই দেখেছি। মিষ্টার লরীর সঙ্গিনী সেই মহিলা—আমিই।

—চ্যানেল পার হওয়ার সময়ে আসামীর সঙ্গে আপনার কোন আলাপ হয়েছিল—মিস্ ম্যানেট ?

—হয়েছিল।

—মনে ক'রে বলুন ত'—কী কথা হয়েছিল !

—ভদ্রলোকটি যখন ষ্টীমারে উঠলেন—

—বলুন—আসামী।

—আ—চ্ছা। আসামী যখন ষ্টীমারে উঠলেন তখন খুব হাওয়া ছিল—ঝড়ের বেগে বইছিল হাওয়া। আমার পিতার স্বাস্থ্য তখন খুবই খারাপ ছিল। কী-ভাবে কোথায় তাঁকে রাখলে হাওয়া কম লাগবে তাঁর গায়ে, সেই বিষয়ে দয়া করে উনি পরামর্শ দিয়েছিলেন আমায়। এইভাবেই আলাপের সুরু হয় তাঁর সঙ্গে।

—উনি কি একা এসেছিলেন ষ্টীমারে ?

—না, হু'জন ফরাসী ভদ্রলোক ছিলেন ওঁর সঙ্গে।

—কোন কাগজপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল কি—আসামী আর তাদের ভিতর ?

—হ্যাঁ, তবে কী কাগজ, তা জানি না আমি।

—কী কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে আসামীর ?

—উনি বলেছিলেন—খুব গোপনীয় কাজে উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে কাজ যে কী, তা প্রকাশ হয়ে পড়লে অনেক লোক বিপদে পড়ে যেতে পারে হয়তো। সেইজন্য উনি ভ্রমণ করছিলেন বেনামীতে। অনেকবার ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের মাঝে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, এবং পরে আরও অনেকবার হয়তো ঘুরতে হবে, এ রকম কথাও বলেছিলেন তিনি।

—আমেরিকা সম্বন্ধে কিছু বলেছিল আসামী ?

—আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের কলহ কী করে সুরু হলো, তাই বলেছিলেন তিনি। তাঁর মতে ইংলণ্ডেরই অন্যায় ছিল এ কলহে। রহস্য করে তিনি এ-কথাও বলেছিলেন যে, হয়তো ইতিহাসে জর্জ ওয়াশিংটনের নাম, রাজা তৃতীয় জর্জের সমানই গৌরব লাভ করবে একদিন। তবে কথাটা নিছক রহস্যই, আমাদের মহান্ রাজাকে খেলো করবার উদ্দেশ্য ওর ভিতর ছিল না মোটেই।

এইভাবে সাক্ষ্য দিতে, কুমারী ম্যানেট যে খুবই দুঃখ অনুভব করছেন, তা, আদালত কক্ষে উপস্থিত অগণিত লোক কারুরই বুঝতে বাকী ছিল না। সত্যিই দুঃখের কারণ ছিল কুমারীর। ডার্ণে যেরকম ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন জাহাজের উপর, তাতে তাঁর কাছে কুমারী কৃতজ্ঞ হয়েই আছেন। অথচ সত্যের খাতিরে যে-কথা তাঁকে এখন বলতে হ'চ্ছে আদালতে, তা হয়ত জুরীর বিচারে ডার্ণের বিরুদ্ধেই যাবে। ডার্ণের যদি মৃত্যুদণ্ডই হয়, তবে তার জন্য কুমারী ম্যানেটকেও খানিকটা নিমিত্তের ভাগী হ'তে হবে বই কি !

অতঃপর সরকারী উকিল এই মহিলার পিতাকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করলেন। ডাক পড়লো—'ডাক্তার ম্যানেট !'

—ডাক্তার ম্যানেট, এই আসামীকে দেখুন। পূর্বে একে দেখেছেন কখনো ?

—একবার আমার লণ্ডনের বাসায় এসেছিলেন উনি। তিন বা সাড়ে-তিন বৎসর আগে।

—ষ্টীমারে একে দেখেছিলেন আপনি ? আপনার কন্যার সঙ্গে আসামীর যে আলাপ হয়েছিল সেই ষ্টীমারে—তা শুনেছিলেন আপনি ?

—আমি এ-সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারি না মহাশয়।

—না পারবার কোন বিশেষ কারণ আছে কি ?

—আছে।—অত্যন্ত নিম্নস্বরে এই কথা বললেন ম্যানেট।

—বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আপনাকে কি কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল স্বদেশে ?

—দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ দিন !—এমন করুণ সুরে ম্যানেট এই কথা বললেন যে, উপস্থিত সমস্ত লোকের হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠলো তা শুনে।

—আপনি কি ঐ ষ্টীমারে উঠবার অল্প দিন আগে মুক্ত হয়েছিলেন —সেই কারাবাস থেকে ?

—তাই শুনেছি বটে।

—আপনার কি সে-কথা কিছুই মনে নেই ?

—কিছু না। কারাগারে কবরস্থ হবার কিছুদিন পরেই আমার স্মৃতি, বুদ্ধি, চৈতন্য সবই লোপ পায়। আমার মাথা এবং মন তখন ছিল একেবারে শূন্য। সে সময় আমি জুতো সেলাই করতাম কেবল। নিজের এবং পৃথিবীর সম্বন্ধে আমি আবার সচেতন হয়ে উঠলাম, লণ্ডনে আসবার পর, আমার এই কন্যার সেবায় ও সাহচর্যে। আমার মানসিক-শক্তি ফিরে পাবার কত দিন আগে থেকে যে কন্যার সেই সেবা ও সাহচর্য আমি পাচ্ছিলাম—সে-সব কিছুই মনে নেই আমার।

সরকারী উকিল এইবার আর-একজন সাক্ষী ডাকলেন। সে লোকটির বক্তব্য এইরকম ঃ

পাঁচ বৎসর আগে নভেম্বর মাসের এক শুক্রবার রাত্রে ডোভার-মেলের অনেক যাত্রীর ভিতর আসামী ছিল একজন। পথের কোন এক স্থানে সে নামে। তারপর মাইল-বারো পথ সে ফিরে আসে পায়ে হেঁটে, পুলিশের চোখে ধূলো দেবার জন্য। ফিরে আসে এক সহরে যার অতি নিকটে রয়েছে রাজার এক বৃহৎ সেনানিবাস। সেখানে এসে সেনানিবাসের খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করে সে। এই সময়ে এক হোটেলে সাক্ষী তাকে দেখতে পায়। জীবনে সেই একবারই দেখেছে আসামীকে ; এই আসামী যে সেই ব্যক্তি, তাতে সাক্ষীর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

এ সাক্ষী সত্যই বিপদ ঘটাবে। আসামীর উকিল জেরা করেও ওর কোন গলদ বার করতে পারছেন না। এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটলো।

আসামীর উকিলের নিকটেই আর-একজন উকিল ছাদের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন গোড়া থেকে, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ভদ্রলোক হঠাৎ এক-টুকরো কাগজে কি লিখে আসামীর উকিলকে ছুঁড়ে মারলেন। তিনি সে কাগজ পড়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন একবার আসামীর মুখের দিকে, আর একবার সেই পত্রলেখক উকিল বন্ধুর দিকে। এইবার তিনি প্রশ্ন করলেন সাক্ষীকে—

—তুমি সেই হোটেলে যাকে দেখেছিলে, সে যে এই আসামী, এ-কথা তুমি শপথ করে বলছো?

—অবশ্য।

—আসামীর সঙ্গে চেহারায় হুবহু মিল আছে, এমন কোন লোককে তুমি দেখেছো কখনো?

—এমন মিল কারো দেখিনি—যাতে লোক ভুল হবে, মশাই!

—ঐ যে উকিল ভদ্রলোক বসে আছেন ছাদের দিকে তাকিয়ে,

ওঁকে দেখ ত' একবার! তারপর আসামীকে দেখ আবার!—কী বলো এখন? একজনকে দেখে আর-একজন বলে ভুল হতে পারে কি?

উকিলের এই অদ্ভুত অনুরোধে শুধু সাক্ষী কেন, আদালতসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। একজনকে দেখে আর-একজন বলে ভুল! ওরা কি যমজ ভাই নাকি?—জজ, জুরি, উকীল, পুলিশ, শত-শত দর্শক—সবাই দম বন্ধ ক'রে তাকাতে লাগলো—একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে। জজের আদেশে উকিল ভদ্রলোক মাথার পরচুলা খুলে ফেলে দিলেন। এইবার আর কারোই সন্দেহ রইল না যে, একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে, হু'জনের মুখের চেহারায়। আসামী হয়তো একটু বেশী সংযত ও গম্ভীর, উকিল-লোকটির মুখে-চোখে হয়তো অসংযত জীবন যাপনের দরুন হু'চারটে বাড়তি রেখাপাত হয়েছে এখানে-ওখানে, কিন্তু মোটামুটি সাদৃশ্য অতিশয় প্রবল। যে-লোক এঁদের তুজনকেই খুব ভালরকম চেনে না, তার চোখে হু'জনের চেহারার ঐ অতি সামান্য পার্থক্যটুকু দিনের আলোতেও ধরা পড়া সম্ভব নয়।

"তাহ'লে কি মিষ্টার কার্টনকেই এখন রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করতে বলছেন নাকি?" জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন আসামীর উকিলকে।

কার্টন হলো ঐ উকিল-ভদ্রলোকের নাম, আসামীর সঙ্গে যাঁর চেহারার মিল মামলাটিকেই বান্‌চাল করে দিতে বসেছে।

কার্টনকে অভিযুক্ত করার অভিসন্ধি কারোই ছিল না, কিন্তু ডার্ণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা-কিছু ছিল, তার অর্ধেকেই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। জুরীরা অনেক বিবেচনা ও বিতর্কের পরে রায় দিতে বাধ্য হলেন যে, আসামীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবার মত জোরালো প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় নি। অগত্যা জজ ডার্ণেকে মুক্ত করে দিতে আদেশ দিলেন, ঘোর অনিচ্ছায়। অনিচ্ছা এইজন্য যে, জর্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে ডার্ণের উচ্চ ধারণা ভয়ানক চটিয়ে দিয়েছে

রাজভক্ত জজ বাহাদুরকে। কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ তার বিরুদ্ধে থাক বা না-থাক, ডার্ণেকে দণ্ড দিতে পারলেই তিনি খুসী হ'তেন।

ডার্ণে মুক্ত হলেন, এবং সেই থেকে ম্যানেট-পরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা গাঢ়তর হয়ে উঠলো। মামলার কালে লুসী ম্যানেট ও তাঁর পিতা ডার্ণের উপর যে সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, তার দরুন ডার্ণে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে রইলেন তাঁদের কাছে।

ওদিকে একান্ত অপরিচিত মাতাল যুবক সিডনি কার্টনও এই সূত্রে পরিচিত হয়ে উঠলো ম্যানেট-পরিবারের সঙ্গে। ডার্ণের সঙ্গে তার চেহারার মিল সকলেরই একটা বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রইলো!

এই মিল যে ওদের সকলেরই জীবনের উপরে কতখানি ছায়াপাত করবে ভবিষ্যৎ-জীবনে, সে-কথা কিন্তু তখন কেউ বুঝতে পারেনি।

চার

দণ্ডমুণ্ডের মালিক

প্যারী নগরে বিরাট এক রাজপ্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ বটে—কিন্তু এই প্রাসাদের মালিক ঠিক রাজা নন্। রাজার ঠিক নীচেই যাঁদের স্থান, রাজার অসীম প্রতাপ আর ক্ষমতা পরিচালিত হয় যাঁদের হাত দিয়ে, ইনি তাঁদেরই একজন।

এঁর দরবারে সেদিন সকাল বেলায় অগুন্তি লোকের আমদানি হয়েছে। সবাই প্রভুর দর্শনের অভিলাষে এসেছে। প্রভু যেন ভুলে না যান, এইজন্যই হাজিরা দেওয়া। আর হাজিরা দিতে যারা এসেছে—তারাই কি বড় নগণ্য? দু'চারটে মার্কুইস মার্শালও আছে ঐ দলে—যারা নিজের-নিজের এলাকায় প্রত্যেকেই হাজার হাজার লোকের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

সারি-সারি ঘর। এক ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরের দরজা। বহুমূল্য আসবাবে, রাজকীয় আড়ম্বরে সাজানো সব ঘর। সব ঘরেই অভ্যাগতের ভিড়। প্রভু আছেন এই সারিবদ্ধ ঘরের শেষ ঘরখানিতে। দরজা বন্ধ ক'রে চকোলেট পান করছেন তিনি। চারজন সুদক্ষ চাকরের সাহায্য দরকার হয় প্রভুর, চকোলেট খাবার সময়।

চারজনের জায়গায় তিনজন হ'লে চলে না। অচল ত' হয়ই, প্রভু নিজেকে অবহেলিত, অপমানিত মনে করেন। এ-রকম অঘটন ঘটেনি কোনদিন, ঘটতো যদি—ফরাসী দেশকে রসাতলে দিতেন প্রভু! চারজন ভৃত্যের কমে চকোলেট খাওয়া?—কী ক'রে হতে পারে? একজন নিয়ে আসবে চকোলেটের স্বর্ণপাত্র, একজন নাড়বে সেই চকোলেট সোনার কাঠি দিয়ে, আর একজন সোনার তারে গাঁথা চীনদেশের রেশমী কাপড় দিয়ে ঢাকা দেবে প্রভুর অঙ্গ, যাতে চকোলেটের ছিটেফোঁটা না প'ড়ে যায় সে দেবদেহে, আর,

চতুর্থ ব্যক্তি—এ হলো স্বয়ং সর্দার-খানসামা—এর জামার তুই পকেটে তুটো সোনার ঘড়ি বাজে টিক্‌টিক্ করে—যেন তারা বলছে—টিক্ টিক্, ঠিক্ ঠিক্, এইভাবেই চলছে চিরদিন, এইভাবেই চলবে ঠিক্! ঠিক্ ঠিক্! টিক্ টিক্!

হ্যাঁ, কী বলছিলাম, এই ডবল সোনার-ঘড়িওয়ালা সর্দার-খানসামা চকোলেট ঢেলে দেবে সোনার পেয়ালায়, তবে তা প্রভুর পানযোগ্য হবে! কারণ ইনি প্রভু, প্রভুদেরও প্রভু! এঁর উপরেও আর-এক প্রভু আছেন বটে, তিনি স্বয়ং রাজা। কিন্তু রাজার সঙ্গে সরাসরি ধরা-ছোঁয়ার ভিতর কম লোকই আসে। রাজশক্তির উত্তাপ নিজেদের অঙ্গে ধারণ ক'রে এই প্রভুর দলই জনসাধারণকে পুড়িয়ে মারেন। সূর্যের তেজে গরম হয়ে ওঠে মরুভূমির বালুকা। রৌদ্রের চেয়ে সেই তপ্ত বালুকাই বেশী অসহ্য লাগে মরুপথের পথিকের কাছে।

চকোলেট পানপর্ব অবশেষে সাঙ্গ হলো। রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। প্রভুর উদয় হলো তাদের সমুখে, যারা দলে দলে বাইরে ব'সে আছে একটিবার তাঁর দর্শন পাবার জন্য। ডাইনে-বাঁয়ে মাথা সব নুয়ে পড়তে লাগলো কর্তিত শস্যের মত। কাউকে একটি কথা, কারুর উপর একটুখানি হাসি, কারুর পানে চোখের কোণের এতটুকুন দৃষ্টি বর্ষণ করতে-করতে প্রভু চলেছেন কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করে। শেষপ্রান্তে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন এক ব্যক্তি, ইনিও প্রভুজাতীয়। গৃহস্বামী-প্রভুর মত অতবড় প্রভু না হলেও, ইনিও বড় কম যান না। দেয়ালে কোন ইতালীয়ান ওস্তাদ-শিল্পীর আঁকা ম্যাডোনা চিত্র। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হয়তো তিনি সেই মাতৃমূর্তির সৌন্দর্যই দেখছিলেন, যদিও নিজের জীবনে মায়েদের সম্মান কমই রক্ষা করা অভ্যাস তাঁর। মাতৃজাতি ত' তাঁর খেলার বস্তু! অর্থাৎ ওঁর একার নয়,—সেই সময়কার প্রভু-জাতিরই খেলার বস্তু!

গৃহস্বামীকে সামনে দেখে অন্য সবাইয়ের মত তটস্থভাব মোটেই দেখালেন না ইনি। অনেকটা সমকক্ষের মতই অভিবাদন করলেন তাঁকে। ভাবটা এই আজ তুমি রাজার কৃপালাভ ক'রে খানিকটা

উঁচুতে উঠে গেছ বটে, কিন্তু কাল পাশা উল্‌টে যেতে পারে। তখন তোমার পদে আমি বসবো হয়তো, আর আমার বাড়ীতে তুমি হাজিরা দেবে স্বার্থের খাতিরে।

আগন্তুক-প্রভুর মনের ভাব গৃহস্বামী-প্রভুর অজানা থাকবার কথা নয়, কারণ, এ-সব ব্যাপারে প্রভুরা পরস্পরের মনের ভাব ঠিকই বুঝতে পারেন। তিনি গম্ভীরভাবে ঠিক সেইটুকুন সৌজন্যই দেখালেন —যা না দেখালে শিষ্টাচার বজায় থাকে না। যে চমৎকার কায়দায় আগন্তুকের নমস্কার তিনি ফিরিয়ে দিলেন, তাতে স্পষ্টই ফুটে উঠলো তাঁর মনের কথা—অত আশা ক'রো না বন্ধু! রাজার কৃপা তোমার বরাতে নেই, আর আমি গিয়ে তোমার বাড়ীতে হাজিরা দেবো কোনদিন—এ আশা মগজে স্থান না দেওয়াই তোমার ভালো।

গৃহস্বামী পিছন ফিরলেন, তুশো লোককে খুসী ক'রে বিদায় করার ঝামেলা মিটিয়ে দিলেন পাঁচ মিনিটের ভিতর। তিনিও নিজের খাস-কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, অভ্যাগত প্রভুটিও রুক্ষ মেজাজে মুখটি কালো ক'রে ত্যাগ করলেন সে গৃহ। আসবার তাঁর ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু না এলেও সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবার সম্ভাবনা। যতক্ষণ যার হাতে ক্ষমতা রয়েছে, তাকে তোয়াজ করতে হবে বইকি, তা সে যতই দাম্ভিক হোক!

অভ্যাগত প্রভুর চার ঘোড়ার গাড়ী সিঁড়ির নীচেই অপেক্ষা ক'রে আছে। প্রভু উঠে পড়লেন, ইসারা পেয়ে বায়ুবেগে গাড়ী চালিয়ে দিলো কোচোয়ান। জনাকীর্ণ নগরীর রাজপথ; তাও যে আবার সব জায়গায় তা সমান প্রশস্ত, তা নয়। তার উপর দিয়ে এ-রকম বেগে গাড়ী চালানো নিরাপদ নয় জেনেও কোচোয়ান চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগলো ঘোড়ার গায়ে। তেজী ঘোড়া ছুটলো ঝড়ের মত। পথচরেরা চাপা পড়তে-পড়তে ছুটে পালাতে লাগলো। তাদের প্রাণ বাঁচানো তাদেরই কাজ। ঘোড়ার পায়ের তলায় প'ড়ে মরে যদি তারা, ঘোড়ার কোন দোষ হবে না, কোচোয়ানের ত' নয়ই। আরোহী? আরোহী যদি নেমে এসে

মৃতের আত্মীয়দের ধ'রে চাবুক না মারেন, তবে তাঁর নাম রটে যাবে দয়ালু ব'লে !

ঘড়্-ঘড়্ ঝন্-ঝন্ ঘটাং-ঘটাং শব্দ ক'রে ছুটে চলেছে গাড়ী। ঝড়ের বেগে ছুটেছে, মোড়ের পর মোড় ঘুরে যাচ্ছে সেই ঝড়ের বেগে। নারীরা চীৎকার ক'রে পালাচ্ছে পথ ছেড়ে, পুরুষেরা টানাটানি করছে শিশুদের। হৈ-হৈ ব্যাপার ! রৈ-রৈ কাণ্ড ! মার্কুইসের গাড়ী ! সামাল্ !

পথের ধারে একটা ফোয়ারা। অনেক নারী ও শিশু সেখানে। নারীরা জল ভরছে, শিশুরা কাদা মাখছে। ঝড়ের বেগে এসে পড়লো মার্কুইসের গাড়ী। একটা রব উঠল—পালাও ! পালাও !

একখানা চাকা ধাক্কা খেয়েছে কিসের সঙ্গে যেন। একটা আর্ত-কোলাহল চারিদিকে। ঘোড়ারা পা তুলে লাফিয়ে উঠলো।

ঘোড়ারা লাফিয়ে উঠলো বলেই গাড়ী থামলো। তা নইলে থামবে কেন ? গাড়ীর তলায় মানুষ চাপা প'ড়ে থাকে অমন, তা বলে প্রভুদের গাড়ী থেমে পড়বে রাস্তার মাঝখানে, অমন আশা করে না গরীবেরা। কিন্তু এ-যাত্রা ঘোড়ারা লাফিয়ে উঠেছে, গাড়ী থামাতেই হলো। মার্কুইস মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—হলো কি ?

লম্বা একটা লোক, ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে টেনে বার করেছে একটা মাংসপিণ্ড, আর কাদার উপর সেইটেকে রেখে, তার উপরে প'ড়ে চীৎকার করছে হাউ-হাউ ক'রে।

ছেঁড়া কাপড় পরা একটা লোক বিনীত স্বরে বললে—মহান্ মার্কুইস ! ক্ষমা করুন প্রভু !—একটা বাচ্চা চাপা পড়েছে !

—ও লোকটা অমন জানোয়ারের মত চেঁচায় কেন ? ওরই বাচ্চা বুঝি ?

—তাই বটে হুজুর। ওরই ছেলে বটে !

লম্বা লোকটা হঠাৎ রক্তমাখা মাংসপিণ্ডের উপর থেকে লাফিয়ে উঠলো, ছুটে এলো গাড়ীর দিকে। দুই হাত মাথার উপর তুলে চীৎকার ক'রে বললো—মেরে ফেলেছে ! মরে গেছে আমার ছেলেটা !

সে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো মাকু´ইসের দিকে—চোখে তার যেন বিজলীর ঝলক !

বহু লোক গাড়ীর চারিপাশে। সবাই তাকিয়ে মাকু´ইসের দিকে—কী তিনি বলেন—শুনবার জন্য কান খাড়া করে আছে তারা ; কী তিনি করেন—দেখবার জন্য চোখে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু সে দৃষ্টিতে ক্রোধ নেই, মুখেও তাদের ভাষা নেই। মহান্ মাকু´ইস একবার সবাইয়ের দিকে এক-নজর দেখে নিলেন, নিছক তাচ্ছিল্য তাঁর সে নজরে। অপরিসীম তাচ্ছিল্য—যেন গর্ত থেকে এক পাল ইঁদুর বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমুখে ! টাকার থলে বার করলেন মাকু´ইস ! তারপর তাঁর মুখ থেকে ধীরে ধীরে বেরুলো ঃ

—আমি দেখে অবাক্ হয়ে যাই যে, তোদের নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার, বা ছেলেগুলোকে সাবধানে রাখার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। একটা-না-একটা সর্বদাই এসে পড়ছে গাড়ীর সমুখে ! কী জানি আমার ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়ে গেল কি না ! নে, এইটে দে ওকে !

একটা মোহর থলে থেকে নিয়ে তিনি ভিড়ের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সমস্তগুলো ঘাড় সেইদিকে ফিরলো, সমস্তগুলো চোখ দেখতে লাগলো—মোহরটা কী-রকম ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে আবার ঘুরপাক খেয়ে নীচে নামতে লাগলো। শুধু লম্বা লোকটা আবার দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—মেরে ফেলেছে ! মরে গেছে ছেলেটা !

অনেকবার সে এইভাবে চীৎকার করেছে, আরও কতবার যে এইভাবে চীৎকার করতো—কে জানে ! কিন্তু এই সময়ে আর একটি লোক জোর-পায়ে এসে হাজির হলো সেখানে। তাকে দেখে অন্য সবাই পথ ছেড়ে সরে গেল। লম্বা লোকটা এই আগন্তুকের কাঁধের উপর মাথা রেখে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে সুরু করলো এইবার। একটা আঙুল তুলে কেবল সে ফোয়ারার দিকে দেখাতে লাগলো—যেখানে এক রক্তমাখা মাংসপিণ্ড ঘিরে পাড়ার মেয়েরা ঘুরছে আর ফিরছে—নীরবে, মাথা নীচু ক'রে।

আগন্তুক বললো—সব শুনেছি, সব জানি ভাই গ্যাসপার্ড। ভালোই হলো, বাচ্চাটার পক্ষে এ ভালোই হলো। যে-ভাবে মানুষ বাঁচে এ-দেশে, সে-ভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো গ্যাসপার্ড! বুক বাঁধো ভাই! বুক বাঁধো!

মাকু´ইসের বাঁকা-অধরে খেলে গেল মৃদুহাসি। সে হাসি নিছক অবজ্ঞার।—বাঃ! তুমি ত' জ্ঞানী লোক দেখছি! নাম কি তোমার?

—ডিফার্জ।

—কী করো?

—মহান্ মাকু´ইস! আমি মদের দোকানী।

—জ্ঞানী ও মদের দোকানী! এই তোমার বকশিশ!—ব'লে মাকু´ইস আর-একটা মোহর ছুঁড়ে মারলেন ডিফার্জের দিকে। তারপর হুকুম দিলেন—চালাও গাড়ী!

জনতার দিকে আর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি না দিয়ে মহান্ মাকু´ইস গদীতে ঠেসান দিয়ে বসলেন। চলতে চলতে পায়ের গুঁতোয় একখানা মেটে বাসন ভেঙে ফেলেছেন যেন! দাম চুকিয়ে দিয়েছেন —আবার কী?—চালাও!

গাড়ী সবে চলতে সুরু করেছে, এমন সময়ে ঠং ক'রে তাঁরই ছুঁড়ে দেওয়া মোহর উড়ে এসে পড়লো গাড়ীর পাটাতনের উপরে। চমকে উঠলেন প্রভু।

—রোখো! রোখো!—কে ছুঁড়লো মোহর?

মাকু´ইস তাকিয়ে দেখলেন। মদের দোকানী জ্ঞানী ডিফার্জ আর সেখানে নেই। আছে আর একটি কালো শক্ত নারী, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বুনে চলেছে ছবির পর ছবি, সাদা কাপড়ে।

গলার স্বর এক পর্দাও না চড়িয়ে মাকু´ইস বললেন—কুত্তা সব। কে ঐ ঢিল ছুঁড়েছে গাড়ীর ভিতর, জানতে যদি পারতাম! তাকে গাড়ীর চাকার নীচে ফেলে গুঁড়ো করে ফেলতাম আমি!

গাড়ী গড়-গড় ক'রে চলে গেল, ফোয়ারার জল তরতর ক'রে বয়ে চললো! থর-থর ক'রে কাঁপতে-কাঁপতে ইঁদুরের দল ঢুকলো—যে যার

গর্তে। একটা ছেলে মরে গেছে, সেটা বড় কথা নয় ; বড় কথা এই যে মার্কুইস রেগেছেন! কাজেই কাঁপছে ইঁদুরেরা।

সেই রাত্রে।

নিজের প্রাসাদে নৈশ-ভোজনে বসেছেন মহান্ মার্কুইস। টেবিলে দু'জনের খাবার! খাচ্ছেন কিন্তু মার্কুইস একাই। ইংলণ্ড থেকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের আজ আসবার কথা। এখনও পৌঁছোননি তিনি! একাই খেতে বসেছেন মার্কুইস! রাজভোগ! পরম পরিতোষের সঙ্গে ভোজন চলেছে প্রভুর!

পথে একটা ব্যাপার ঘটেছে যা মার্কুইস ঠিক বুঝতে পারেননি! গাড়ীর তলার লোহার কাঠামো ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে একটা লম্বা লোক না-কি এসেছিল বহুদূর! সইস-কোচোয়ানেরা দেখতে পায়নি তাকে, কিন্তু পথচরেরা দেখেছিল। তাদেরই কানাকানি থেকে কথাটা প্রচার হয়ে পড়ে। মার্কুইসের কানে যখন এলো এ-খবর, তখন আর গাড়ীর-তলার লম্বা লোকটাকে কোথাও পাওয়া গেল না ; সে কোন্ ফাঁকে পালিয়ে গেছে!

অবশ্য, কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার পাত্র মার্কুইস নন্—তা সে ব্যাপার যত দুর্বোধ্যই হোক না কেন! তবে হ্যাঁ, খেতে-খেতে দু'তিনবার তিনি ভৃত্যদের বললেন জানলা খুলে দেখতে—বাইরে কোন অচেনা লোককে দেখা যায় কি না। নাঃ, সন্দেহজনক কিছু কোথাও নেই।

গাড়ীর শব্দ!—ঐ বোধ হয় এলো তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র! আসবামাত্রই ভৃত্যেরা তাঁকে জানালো যে মার্কুইসের ঘরে তাঁর খাবার দেওয়া হয়েছে। তিনি এলেন। কে তিনি? তাঁকে আমরা দেখেছি লণ্ডনে। ওল্ড বেইলীর বিচারকক্ষে। তাঁর নাম ছিল তখন, চার্লস্ ডার্নে।

খুবই ভদ্রভাবে ভাইপোকে ডেকে পাশে বসালেন মার্কুইস। কিন্তু সভ্যসমাজের যা রীতি, আপনজনের সঙ্গে দেখা হলে করমর্দন করা, কিন্তু তার জন্য হাত বাড়ালেন না কেউ।

ডার্নে বললেন—আপনি এই এলেন প্যারী থেকে ?

—হ্যাঁ। আর তুমি ?

—সোজা লণ্ডন থেকে !

—অনেক দিন থেকেই আসবার কথা শুনছিলাম তোমার।

—একটু দেরী হয়ে গেল ! কাজ ছিল—

—তা ত' বটেই !

ভৃত্যেরা যতক্ষণ কক্ষে রইলো, এইরকমই মামুলী আলাপ চললো দু'জনের ভিতর। তারপর ভোজন শেষ হয়ে গেল, কফি পরিবেশন ক'রে ভৃত্যেরা চলে গেল ঘর থেকে। তখন ডার্নে বললেন :

যে-কাজের জন্য ঘুরছি কিছুদিন থেকে—আপনি তা জানেন। তারই দরুন আসতে হলো আবার ! এ-রকম যাতায়াত খুবই বিপজ্জনক। এর জন্য বৃটিশ-সরকারের সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছি আমি। মাঝখানে রাজদ্রোহের মামলায় পড়েছিলাম। অতি কষ্টে প্রাণে বেঁচেছি ! অবশ্য, প্রাণ গেলেও দুঃখ ছিল না। যে পবিত্র কাজ মাথায় তুলে নিয়েছি, তার জন্য হাসিমুখে মরতেও পারি আমি।

পিতৃব্য একটুও ব্যস্ত না হয়ে বললেন—আরে না, না, মরতে হবে কেন ?

ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তর করলেন—অবশ্য, আমি মরতে বসলেও যে আপনি আমার রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করতেন না, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

পিতৃব্য হাত নেড়ে একটা প্রতিবাদেরই ভঙ্গী করলেন অবশ্য, কিন্তু সে-প্রতিবাদ যে আন্তরিক নয়, তা বুঝতে কষ্ট হলো না ডার্নের। তিনি যেন স্পষ্ট কথা শোনাবার জন্যই এসেছেন আজ ; পিতৃব্যকে সোজা শুনিয়ে দিলেন—আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি বরং আমার বিপক্ষেই দু'চারটা জোরালো প্রমাণ যুগিয়ে দিতেন, তা আমি বুঝি।

আশ্চর্য মানুষ এই মাকু'ইস ! একটুও বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হয়ে মিষ্টস্বরে বললেন—আরে, না—না ! বলো কি ?

ডার্ণে সে-কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কাজে বাধা দেবার শক্তি থাকলে আপনি কি তা দিতেন না ?

মাকু´ইসের অধরে চকিতের জন্য ক্ষীণ হাসি দেখা দিয়ে তা মিলিয়ে গেল। তিনি উত্তর করলেন—তা যে দিতাম, সে কথা ত' আগেই বলেছি !

—সম্ভব হ'লে আপনি আমাকে ব্যাষ্টিলে আবদ্ধ করতেন। বলুন, এ কথা সত্য কিনা !

—খুবই সত্য ! ব্যাষ্টিলে কিছুদিন রাখতে পারলে তোমার উপকার হতো। নির্জন কারাবাসে চিন্তার সময় পাওয়া যায়। আর চিন্তাতেই মানুষের স্বভাব শোধরায়।

ডার্ণে হেসে বললেন—তাহ'লে বলতে হয় যে, এ-দেশের বর্তমান শাসক যারা, তাঁদের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব নেই বলেই আমি এখনো স্বাধীন আছি ?

তিক্তকণ্ঠে মাকু´ইস বললেন—কী যে হলো দেশটার ! অল্পদিন আগেও আমরা যা খুশী তাই করেছি। যাকে দরকার ব্যাষ্টিলে পাঠিয়েছি, যাকে ইচ্ছে ফাঁসীতে লটকেছি ! কিন্তু সেভাবে চলতে গেলে এখন যেন সুবিধে হবে না ব'লে মনে হয় মাঝে-মাঝে ! একটা নতুন কথা শুনতে পাই এখন। জনগণের স্বাধীনতা ! হাঃ হাঃ— কী গেরো বল দেখি ! হতাশভাবে মাকু´ইস এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে দিলেন।

ডার্ণে উত্তর করলেন—সেইভাবে চ'লে-চ'লে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে —ছিঃ ছিঃ ! আমাদের এই বংশকে যতটা অভিশাপ দেয় এ-দেশের লোক, এমন আর বোধ হয় কাউকে নয় !

মাকু´ইস যেন খুশী হয়ে বললেন—তাই ত' চাই ! যে অভিশাপ দেয়, বুঝতে হবে যে প্রতিহিংসা নেবার শক্তি তার নেই !

এ-কথার উত্তরে ডার্ণে নতমুখে তাকিয়ে রইলেন টেবিলের দিকে। উদ্বেগ আর নৈরাশ্য তাঁর বসার ভঙ্গী থেকেই ফুটে বেরুচ্ছিলো যেন। আর মাকু´ইস ? তিনি যখন কথা কইলেন আবার, তা থেকে ফুটে

বেরুলো শুধু অসহ্য দম্ভ। ব'লে চললেন—যত দিন এই প্রাসাদের উপর ছাদ বজায় থাকবে, ততদিন চাবুকের চোটে কুকুরের দলকে ঠাণ্ডা রাখবো বৎস! নিজেকে বড় ক'রে রাখার সহজ পথ দুনিয়ায় চিরদিনই একটি মাত্র—সে হচ্ছে, অত্যাচার!

ডার্ণে বললেন—অন্যায় করলেই সাজা পেতে হয় তার জন্য। আমরা অন্যায় করেছি, তারই সাজা আসছে কিস্তিতে-কিস্তিতে। প্রথম কিস্তি এই অভিশাপ।

—আমরা অন্যায় করেছি?—মার্কুইস জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কারা?

—আমরা অভিজাতেরা! সে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আমরা ইংলণ্ডে থাকা। মা আমায় আদেশ ক'রে গিয়েছেন মৃত্যুকালে—এ জমিদারীর সঙ্গে সংস্রব না-রাখতে! অত্যাচারিত প্রজাদের মাথায় নতুন অত্যাচারের বোঝা আমি যেন কোনদিন না চাপাই, মা আমায় মিনতি করে গিয়েছেন বারবার।

মার্কুইস ব্যঙ্গের সুরে বললেন—জমিদারী আগে পাও ত', তারপর সে-কথা। আমি ত' আজই মরছি না!

ডার্ণে বললেন—না, সে কামনা আমি করি না। আপনি আরও দীর্ঘ দিন বাঁচুন!—তবে আপনার দেহান্ত ঘটলে এ-সম্পত্তি যদি আমার হয়, হবেই অবশ্য,—আমি এর পরিচালনার নতুন ব্যবস্থা করবো। গরীব প্রজার দুর্গতি যাতে দূর হয়, তারা যাতে পেট ভ'রে খেতে পায়, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে পায় সত্যিকার মানুষের মত, তা আমি করবো সেদিন।

—এবং তুমি নিজে উপবাস করবে—প্রজাদের ভর-পেট খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে—এই ত'?—বিদ্রূপ ক'রে উঠলেন মার্কুইস।

উত্তেজিত হয়ে ডার্ণে বললেন,—উপবাস? উপবাস কেন করবো? এখন কি আমি উপবাস ক'রে আছি? যে খেটে খেতে পারে, তাকে কখনো উপবাস করতে হয় না! শুধু আমি কেন, বহু ফরাসী-

ভদ্রলোকই এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে গিয়েছেন—নিজের চেষ্টায় নিজের জীবিকা অর্জন করবার জন্য।

আবার বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো মাকু'ইসের মুখে।—বহু ফরাসী-ভদ্রলোক ? তার ভিতর বোভেয়াবাসী এক ডাক্তার আছেন বোধ হয় ? চেনো সে ডাক্তারকে ? ডাক্তার ম্যানেট ?

মাকু'ইসের হাসির কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত ডার্ণে সংক্ষেপে বললেন—চিনি।

—বেশ, বেশ। ম্যানেটের এক মেয়ে আছে নয় ? তোমার এ নতুন মতবাদের মূলে কি—সেই ম্যানেটের মেয়ে ? যাক্‌গে, ঘুম পাচ্ছে আমার ! কাল আবার কথা হবে বৎস। শুভরাত্রি !

এই ব'লে মাকু'ইস ঘণ্টা বাজালেন। ভৃত্যেরা আলো নিয়ে এলো ডার্ণেকে তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে যাবার জন্য। মাকু'ইসও নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন গিয়ে। কিন্তু আজ কেন চোখে ঘুম আসে না ?

সুকোমল সুগন্ধি রাজশয্যায় শুয়ে মাকু'ইসের নয়নে তবু নিদ্রা নেই। চোখের সামনে ছবির পর ছবি ভেসে ওঠে। ঘরের ভিতর অন্ধকার ; কিন্তু সে অন্ধকারের বুক থেকে ফুটে ওঠে রক্তরাঙ্গা সব ছবি। প্যারীর রাজপথ, রাজপথের কোণে ফোয়ারা, গাড়ীর চাকার নীচে দলিত মাংসপিণ্ড···মুমূর্ষু চীৎকার করছে···অন্ধকারে রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছে শিশিরের মতন।

এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঘস্-ঘস্ শব্দ ঘরের ভিতর ! মাকু'ইস চকিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু ভৃত্যদের ডাকবার আগেই একখানা ছোরা আমূল বিঁধে যায় তাঁর হৃদয়ে। প্রায়শ্চিত্তের পালা সুরু হয়েছে এবার !

* * *

সেই গ্যাসপার্ড ! যে একদিন লাল মদ দিয়ে দেওয়ালের গায়ে লিখেছিল—"রক্ত ? রক্ত !" যে একদিন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল পুত্রকে মাকু'ইসের গাড়ীর তলায় চাপা পড়তে দেখে ! সেই গাড়ীর নীচেকার লৌহদণ্ড ধ'রে ঝুলতে-ঝুলতে মাকু'ইসের অনুসরণ করেছিল !

গ্যাসপার্ড কিন্তু ধরা পড়লো ! পালাতে পারলো না। মার্কুইসের প্রাসাদের পায়ের তলায় মাথা গুঁজে প'ড়ে আছে যে গরীবদের গ্রাম, সেইখানে হলো তাঁর ফাঁসী। চল্লিশ ফুট উঁচুতে তুলে ফাঁসী দেওয়া হলো তাকে। সেই চল্লিশ ফুট উঁচুতে ঝুলতে থাকলো তার দেহ, যতদিন না পচে গলে খসে পড়লো তার হাত-পাগুলো—চল্লিশ ফুট নীচের গ্রামের ভিতর। জমিদার খুন? এ-পাপের এমনি চরম দণ্ড না দিলে দেশে শান্তি রক্ষা হবে কি ক'রে?

দিন যায়। অত বড় দাপট যে মার্কুইসের, তিনি আর নেই! যিনি চাবুকের চোটে সায়েস্তা রাখতে চেয়েছিলেন দেশের লোককে, তিনি হঠাৎ-ই দেশকে অভিভাবকশূন্য ক'রে চলে গেলেন পরলোকে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—যিনি বিশ বৎসরের ভিতর জমিদারী হাতে পাবার প্রত্যাশা করেননি, তিনি হঠাৎ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করেই দেখতে পেলেন—জমিদারী পেয়ে গেছেন তিনি। গ্যাবেলকে ডেকে পাঠালেন।

গ্যাবেল হলো মার্কুইসের তহশীলদার। খাজনাপত্র সেই আদায় করে। এখন থেকে আর কোন খাজনা আদায় হবে না প্রজাদের কাছে, বরং উল্‌টে সকল রকমে তাদের সাহায্য করা হবে জমিদারীর সঞ্চিত অর্থ থেকে, এই সোজা আদেশ দিয়ে ডার্ণে প্রস্থান করলেন লণ্ডনে। এই অভিশপ্ত জমিদারীতে বাস করবেন না তিনি, পাছে সংক্রামক ব্যাধির মত তাঁর মনেও ক্ষমতার মোহ সঞ্চারিত হয়।

ডার্ণে চলে গেলেন, গ্যাবেল নতুন নিয়মে জমিদারী চালাবার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু সে প্রস্তুত হবার আগেই একদিন মার্কুইসের প্রাসাদে আগুন লাগলো! গ্রামের লোকে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সেই আগুন। এ ওকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—আগুনটা চল্লিশ ফুট উঁচুতে উঠেছে কি না!

সেই একই রাত্রে ও-অঞ্চলের প্রত্যেক জমিদারবাড়ীই আগুনে ছাই হয়ে গেল! প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় কিস্তি!

শত্রুরা ম্যানেটকে ব্যাষ্টিল কারাগারে আটক করবার আগে চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। আঠারো বছর নির্জন কারায় বাস ক'রে তিনি যখন স্বাধীনতা ফিরে পেলেন আবার, তখন তিনি পাগল বললেই হয়। ওঁর অবস্থা দেখে মেয়ে লুসী, বা বন্ধু লরী, কেউই আশা করতে পারেননি যে, এই পাগলের মাথা আবার ঠিক হ'য়ে আসবে, তিনি আবার আগের মতই ভালো চিকিৎসক হয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চমৎকার চিকিৎসা করতে পারবেন।

কিন্তু যা আশা করা যায়নি, সেই ব্যাপারও সত্যই ঘটলো। সেই জড়তার আবরণ—ম্যানেটের দেহ-মন যার নীচে একেবারেই চাপা প'ড়ে গিয়েছিল, ভালোবাসার পরশ পেয়ে ধীরে ধীরে তা স'রে যেতে লাগল, যেন রৌদ্রের তাপে বরফ গলে যাচ্ছে। ম্যানেটের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়েছিল একেবারে, তাঁর প্রতিভা পড়েছিল ঘুমিয়ে। লুসী আর লরী—দু'জন দুভাবে তাদের জাগিয়ে তুললেন আবার। পাঁচ বৎসরের ভিতর লণ্ডন-নগরের বড়লোক-মহলে ডাক্তার ম্যানেট সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ব'লে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁর জ্ঞানও অসাধারণ, আবার রোগীর জন্য তিনি খাটেনও খুব বেশী ; কাজেই তাঁর উপার্জনও হয় প্রচুর।

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, চার্লস ডার্ণে। লণ্ডনে ইনি ফরাসী-ভাষা শিক্ষা দেন, ইংরেজ তরুণ-তরুণীদের। এঁরও আয় ভালো। মাঝে মাঝে কেম্‌ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নিজেও পড়াশুনা করেন।

ম্যানেট-পরিবারের সঙ্গে তিনি এখন খুবই মেলামেশা করেন। সেই মামলার পর থেকেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আর একজনও ম্যানেট-পরিবারের বাড়ীতে আনাগোনা ক'রে থাকেন—ঐ

একই সময় থেকে। ইনি অবশ্য ঘনিষ্ঠ হ'তে পারেন নি, কিন্তু এঁকে দেখলেও বাড়ীর লোকেরা খুশী হন, আদর করেই এঁকে গ্রহণ করেন। ইনি সেই মক্কেলশূন্য উকীল—সিড়নী কার্টন—কোর্টে গিয়ে যিনি তাকিয়ে থাকেন ছাদের দিকে, ডার্ণের সঙ্গে যাঁর চেহারার মিল একদা ডার্ণের প্রাণটাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

সে-কথা যাক্। আমরা বলছিলাম—ডার্ণে যে দিন ম্যানেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন সেই দিনের কথা। ডাঃ ম্যানেট তখন অধ্যয়ন করছিলেন। ডার্ণেকে দেখে বই রেখে দিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এসো ডার্ণে! তিন-চারদিন থেকেই ভাবছি তুমি এইবার আসবে, কারণ, কেম্‌ব্রিজে একটানা বেশীদিন থাকা ত' তোমার অভ্যেস নয়! তুমি বসো! লুসী কী-সব কেনা-কাটা করতে গেছে। আসবে এখনই!

—ডাক্তার ম্যানেট! আপনার কন্যা যে এখন বাড়ীতে নেই, তা জেনেই আমি এসেছি। তিনি ফিরে আসবার আগেই ছু-একটা কথা বলতে চাই আমি আপনাকে।

—কি বলবে, বলো!

কীভাবে কথা সুরু করবেন, তা ঠিক করতেই যেন ডার্ণের কিছু সময় কেটে গেল। তারপর তিনি বললেন—কিছুদিন থেকে আপনার এখানে যে-রকম ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছি আমি, তাতে আমার আশা হয়—যে-বিষয়ে আমি কথা কইবো আজ—

ডাক্তার যেন হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিতে চাইলেন ডার্ণেকে। তারপর হাত গুটিয়ে এনে ধীরে ধীরে নিচুগলায় বললেন:

—কথাটা কি, লুসী-সম্পর্কে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—বলো!

—কী আমি বলবো, তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন আপনি। আপনার কন্যাকে আমি ভালোবাসি! সারা হৃদয় দিয়ে! নিঃস্বার্থ-ভাবে! ভক্ত যে-ভাবে পূজা করে উপাস্য দেবীকে, সেইরকম

পূজা করি আমি তাঁকে! এই কথাই বলতে এসেছি আমি আপনাকে।

ডাক্তার ব'সে রইলেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, মাথা নীচু ক'রে। লুসীকে বিয়ে দিয়ে পর ক'রে দেবেন, এ কথা ভাবতেই তাঁর কষ্ট হয়। লুসী ছাড়া জগতে তাঁর কে আছে আর? লুসীই তাঁকে কবর থেকে তুলে এনেছে। লুসীরই সেবা আর যত্নে তিনি নিজের মনুষ্যত্ব আর প্রতিভা ফিরে পেয়েছেন; সমাজে আবার দশজনের একজন হ'তে পেরেছেন। লুসীকে হারালে এ-সবই আবার হারিয়ে ফেলা অসম্ভব নয় তাঁর!

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পর ডাক্তার বললেন—তুমি কি লুসীকে বলেছো এ-কথা?

—না।

—চিঠিতেও লেখোনি?

—কখনো না।

—বলোনি, বা লেখোনি যে, তা আমি বুঝি! আমি ধন্যবাদ দিই তোমায়।

ডার্নে বলতে লাগলেন—ডাক্তার ম্যানেট। আমি জানি, আপনার পক্ষে লুসী এবং লুসীর পক্ষে আপনি কত বেশী প্রয়োজনীয়। শৈশবে লুসী পিতামাতার স্নেহ পাননি, আপনাকে তিনি পেয়েছেন রীতিমত বড় হয়ে। যেন পরলোক থেকে ফিরে পেয়েছেন তিনি আপনাকে। তাঁর অন্তরের স্নেহভক্তি—যা জীবনের প্রথম সতেরোটি বৎসরের ভিতর ফুটে উঠবার কোন পথই পায়নি, তা অকস্মাৎ আপনাকে পেয়ে একান্ত নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলো—এক নিশ্বাসে আপনার উপর উজাড় ক'রে দিল ভক্তি, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস,—নারীর অন্তরে যত কিছু পবিত্র ভাব থাকে সবই। আবার আপনিও আঠারো বৎসর এমন জায়গায় আটক ছিলেন, যার তুলনা করা যায় শুধু কবরের সঙ্গে। সেখান থেকে ভগবানের দয়ায় বেরুবার পরে ঐ মেয়েকে অবলম্বন করেই ফিরে

পেলেন জীবন, স্বাস্থ্য, প্রতিভা, কর্মশক্তি, আশা ও আনন্দ। দেশের বে-আইনী অত্যাচারে, আঠারো বৎসর পূর্বে যে মহীয়সী পত্নীর কাছ থেকে চিরদিনের জন্য আপনাকে দূরে সরে যেতে হয়েছিল, তাঁরই ছায়া যেন আপনি দেখতে পেলেন লুসীর মাঝে! ঐ মেয়েই আপনার জীবনের সম্বল, ওঁকে কেন্দ্র করেই আপনার সংসার, উনিই আপনার চোখের আলো—তা সবই বুঝি আমি। এ অবস্থায় বিয়ে দিয়ে ঐ মেয়েকে পর ক'রে দেওয়া আপনার পক্ষে কতখানি শক্ত, তাও আমি বুঝি! আর বুঝি বলেই, এ বিয়ের প্রস্তাবই আমি উত্থাপন করতাম না, যদি-না এমন একটা উপায় আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হতাম, যাতে আপনাকে দুঃখ পেতে না হয়। আমার প্রস্তাব এই যে, লুসীকে আমি আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবো না, আমিই এসে আপনার কাছে আশ্রয় নেবো—লুসীর পাশে! একটি সন্তানের জায়গায় দু'টি হবে আপনার!

এতক্ষণ নীরব নিস্পন্দ থাকবার পর, ডাক্তার এইবার ডার্ণের হাতের উপর একটুখানি মৃদু চাপ দিলেন। তারপর, এতক্ষণ পরে তিনি মুখ তুলে চাইলেন একবার। তাঁর মুখ দেখেই ডার্ণে বুঝলেন যে অন্তরে তাঁর লড়াই চলেছে একটা; মেয়ের ভাল কিসে হবে সেই চিন্তা একদিকে, আর নিজের সুখ-সুবিধা কিসে বজায় থাকবে—সেই চিন্তা অন্য দিকে। লড়াইয়ে যে নিজের সুখের চিন্তা পরাজিত হতে বাধ্য, তা আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছেন তিনি। বুঝতে পেরে ভয়ও পেয়েছেন; সে-ভয়ের ছায়া তাঁর মুখেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এইবার তিনি ধীরে ধীরে বললেন—ডার্ণে, এমন আন্তরিকতার সুর, এতখানি উদারতার পরিচয় তোমার কথার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে বৎস, যে, তোমায় ধন্যবাদ না দিয়ে আমি পারি না। লুসী তোমায় ভালোবাসে ব'লে কি তোমার মনে হয়?

—এখন পর্যন্ত, কই, সে-রকম কিছু মনে করবার কোন কারণ দেখতে পাইনি আমি।

—আমার অনুমতি পেলে, তুমি কি এখনই লুসীর কাছে কথা তুলতে চাও ?

—না, তাও না। কবে যে সাহস ক'রে তাঁকে এ-কথা বলতে পারবো, তা আমি জানি না ! হয়তো কয়েক সপ্তাহের ভিতরও সে সাহস আমি সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারবো না।

—তুমি কি আমার কাছে পরামর্শ চাও ?

—যদি দয়া ক'রে দেন—

—কোন প্রতিশ্রুতি চাও আমার কাছে ?

—চাই। আর বেশী কিছু নয়, লুসী নিজে যদি কখনো আপনার কাছে পরামর্শের জন্য আসেন এই ব্যপারটি নিয়ে, তাহ'লে আপনি আমার বিপক্ষে কিছু বলবেন না, এইটুকু ভিক্ষা আমি চাই আপনার কাছে।

—সে অনুরোধ আমি রক্ষা করবো তোমার ! তোমার বিরুদ্ধে আমি কখনো কিছু বলবো না—যদি বুঝি যে লুসীর সুখের জন্য তোমার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি জানি না তোমার প্রকৃত নাম, তোমার পারিবারিক ইতিহাস—না, না, এখন সে-সব বলবার প্রয়োজন নেই ! কিন্তু এ-কথা আমি তোমায় বলছি—তোমার নাম বা পারিবারিক ইতিহাস শুনে তোমার উপর যদি আমার দারুণ বিরাগও জন্মে কোনদিন, তাহ'লে সে বিরাগও আমি দমন করবো লুসীর মুখ চেয়ে। আমার নিজের আপত্তির জন্য লুসীর সুখের পথে বাধা হবো না আমি।

* * *

পরের দিন।

একা ঘরে ব'সে সেলাই করছিলেন লুসী ম্যানেট।

ঘরে এসে ঢুকলো সিডনী কার্টন। মক্কেলশূন্য উকীল সিডনী, যার কাজ হলো অন্য উকীলদের কাগজ ঠিক ক'রে দেওয়া, আর কোর্টে গিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকা।

উপার্জন কিছু আছে। অন্য উকীলদের সাহায্য ক'রে বেশ-কিছু

পায় সে। তার বারো-আনা খরচ হয় মদে। সংসারে সে একা। আপনার জন কোথাও কেউ নেই। প্রতিভা ছিল, নষ্ট হয়েছে মদে। কর্মশক্তি ছিল, লোপ পেয়েছে মদে। মনুষ্যত্ব ছিল, প্রায় ধ্বংস হয়েছে মদে। 'প্রায়' বলছি এইজন্য—মাঝে-মাঝে তার আচরণে নিবন্ত-মনুষ্যত্বের ছাই-চাপা পাঁশুটে আলো এখনো এক-আধবার দেখা দেয় বইকি !

সিডনী কার্টন এসে ঘরে ঢুকলো। লুসী অভ্যর্থনা ক'রে বসতে বললেন তাকে। একটু বিব্রত বোধ করলেন বইকি লুসী ! সিডনীকে ঠিক সুস্থ মনে হচ্ছিলো না। লুসীর মনে হলো, হয়তো অতিরিক্ত পান ক'রে এসেছে সে। কিন্তু এ কী ?—সিডনীর মুখে ত' এ-রকম বিষণ্ণ ভাব কখনো দেখা যায় না ! যা দেখা যায় সর্বদা, সে হলো ছোট-বড় কতকগুলো রেখা—যাদের দিকে তাকালেই লোকের বুঝতে বাকী থাকে না যে সিডনী কার্টন কত বড় উচ্ছৃঙ্খল, অসংযমী আর চরিত্রহীন পুরুষ। আজকের এ মলিন মন-মরা ভাব ত' সিডনীর মুখে বড় কেউ দেখেনি কোনদিন।

লুসী প্রশ্ন করলেন—আপনার কি অসুখ করেছে মিষ্টার কার্টন ?

—না। তবে আমি যে-জীবন যাপন করি, তাতে স্বাস্থ্য ত' ভাল থাকবার কথা নয় ! দুশ্চরিত্র লোকের মুখে লাবণ্যের আলো দেখবার আশা করবেন না।

—এর চাইতে ভালো জীবন যাপন করার ত' বাধা নেই, মিষ্টার কার্টন।

—বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আর উঠবার আশা নেই, এখন ক্রমেই নামছি, নামতে থাকবো !

টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে, দুই হাতে মুখ ঢেকে ব'সে রইলো সিডনী। অন্তরের আবেগে সারা শরীর কাঁপছিল তার, টেবিলখানাও কাঁপতে লাগলো তার কনুইয়ের ভারে।

সিডনীর এ-রকম কাতরতা কখনো দেখেননি লুসী। তিনিও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। সিডনী মুখ না তুলেই বলতে লাগলো—আমায়

ক্ষমা করতে হবে কুমারী ম্যানেট ! একটা কথা বলতে এসেছি। কিন্তু বলতে এসে এখন ভয়ে কাঁপছি, এমন গুরুতর কথা সেটা। আপনি শুনবেন আমার কথাগুলি ?

—শুনলে যদি আপনার কোন উপকার হয়, তবে সানন্দে শুনবো !

—এত দয়া আপনার ? ভগবান ভালো করুন আপনার !

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ধীরভাবে বলতে লাগলো সিডনী—ভয় পাবেন না, শুনুন। যা বলবো, তাতে শিউরে উঠবেন না। লোকে বলে না—'আহা ! ছেলেটা মরে গেল, নইলে খুব বড় হতে পারতো ?' আমিও সেইরকম। মরে গেছি। তা নইলে বড় হতে পারতাম !

লুসী বললেন—কেন এ-কথা বলছেন ? আমার ত' মনে হয় এখনো সময় আছে আপনার, ইচ্ছে করলে আপনি এখনো একটা যোগ্য লোক হয়ে উঠতে পারেন।

—আপনার যোগ্য ? একবার কথাটা বলুন মুখ দিয়ে; মিস্ ম্যানেট ! বিশ্বাস করবার মত কথা না হলেও সে কথাটা আমি সারাজীবন মনে রাখবো···সারা জীবন !

লুসীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, তিনি কাঁপতে লাগলেন।

সিডনী ব'লে চললো—এই দেখুন আমাকে ! নিজেকে নিজে নষ্ট করেছি, শরীরটাকে করেছি ধ্বংস !···মাতাল ! প্রতিভার অপচয় ক'রে-ক'রে অন্তর আজ শূন্য ! এই অপদার্থ জীবের ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া যদি আপনার পক্ষে সম্ভবও হতো, তাহ'লেও আমি খুশী হতাম না তাতে। আমি জানি—আমার দ্বারা একটা জিনিসই ঘটতে পারত সে ক্ষেত্রে,—আপনাকে কলঙ্কে ডুবিয়ে, অনুতাপে মনস্তাপে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিজের সাথে-সাথে নরকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া আপনাকে ! তাছাড়া অন্য-কিছু করবার শক্তি ছিল না আমার !—কিন্তু সে সব কথা অবান্তর ! আমি জানি আমার জন্য কোন করুণা আপনার অন্তরে থাকতে পারে না ! পারে না যে—এতে আমি খুশী, মিস্ ম্যানেট !

—সে করুণা না-ই যদি থাকে, তবুও কি আপনার কোন উপকারে আসতে পারি না আমি ? মহত্ত্বের পথে কি আবার তুলে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি না আমি—আপনাকে ? আপনি যে বিশ্বাস ক'রে আপনার হৃদয়ের গোপন ব্যথার কথা আমায় জানিয়েছেন, তার প্রতিদানে আপনার কি কোন উপকারই করতে পারি না আমি ?

লুসীর চোখ জলে ভ'রে এলো। তিনি সকাতরে বললেন—আপনার কোন উপকারে কি আসতে পারি না আমি ?

সিডনী মাথা নেড়ে বললো—না। কিছু না ! তবে আর তু' একটা কথা বলবার আছে। তা যদি শোনেন ধৈর্য ধ'রে, তাহ'লেই যথেষ্ট উপকার করা হবে। আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, আমার জীবনে এই অল্প কিছুদিন আগে থেকে একটিমাত্র সুখস্বপ্নের উদয় হয়েছিল, সে-স্বপ্ন—আপনি। এই গৃহের সুখ-নীড়ের মাঝখানে আপনাকে দেখবার পর থেকেই প্রত্যহ অন্ততঃ একবার আমার মনে হয়েছে—আমার শৈশবের গৃহের কথা—যার কথা তার আগে এতদিন আমার একবারও কখনো মনে হতো না। সেখানে এমনি নির্মল আবহাওয়া চিরদিন বিরাজ করতো, আমার দেবীর মত মায়ের আশে-পাশে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই মাঝে মাঝে মনস্তাপ দেখা দিয়েছে আমার নিঃসাড় প্রাণে—হায়, এ আমি কোথায় নামিয়ে এনেছি আমাকে ! আপনার কাছে আসবার পর থেকেই মাঝে-মাঝে শুনতে পেয়েছি কাদের যেন বিস্মৃত কিন্তু পরিচিত কণ্ঠস্বর —ওঠো, এই পাঁকের ভিতর প'ড়ে থেকো না আর, উঠে চলো আলোর রাজ্যে !—মনে জেগেছে আধ-গড়া সংকল্প—হ্যাঁ, আমি উঠবো, আবার উঠবো, এই আলস্য আর লালসার দাসত্ব ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন করে সুরু করবো সেই জীবন-সংগ্রাম—যা থেকে ভীরুর মত পালিয়ে এসে সকলের পেছনে মুখ লুকিয়েছি আমি !—কিন্তু সে সংকল্প আধ-গড়াই রয়ে গেছে চিরদিন, পুরোপুরি গ'ড়ে উঠতে আর পারেনি, কুমারী ম্যানেট ! শেষ পর্যন্ত সে একটা স্বপ্ন মাত্রই রয়ে গেল…সুখস্বপ্ন ! স্বপ্নই বটে, কুমারী ম্যানেট…কিন্তু আমার জীবনে

স্বপ্নও আজকাল কদাচিৎ আসে। তাই এর মূল্য আছে আমার কাছে, আর তাই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ—আমার জীবনে এ স্বপ্নের উদয় আপনার জন্যই সম্ভব হয়েছিল ব'লে।

লুসী ব্যথিত-কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—স্বপ্ন কি নিছক স্বপ্নই রয়ে যাবে, মিষ্টার কার্টন? ওর এক তিলও কি সত্য হয়ে বজায় থাকবে না আপনার জীবনে?

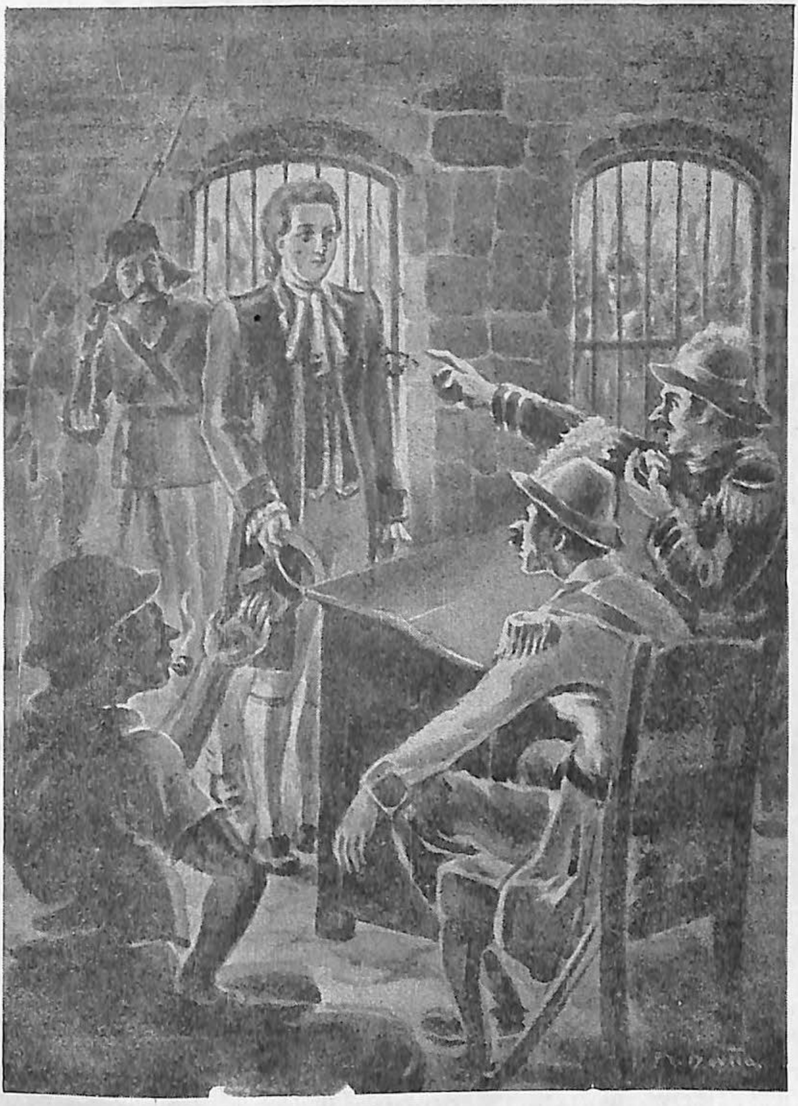
—না, সে আশা নেই। এ হৃদয় ছাইয়ের গাদা, এক কণা আগুনও যদি থাকতো এতে, তারই আলোতে পথ দেখতে পেতাম হয়তো উপরে উঠবার। কিন্তু এ ছাইয়ের গাদা অন্ততঃ এক লহমার জন্যেও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল আপনাকে দেখে, এ আমি ভুলতে পারবো না। ভুলতে পারবো না, কিন্তু উঠতেও পারবো না আমি। আগুন জ্বলে উঠে আবার তখনই নিবে গেছে, সে স্বর্গীয় আগুনকে জ্বালিয়ে রাখবে, এমন কাঠখড় ত আমার এ ছাইয়ের গাদায় ছিল না! প্রেরণা আপনি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার অন্তরে সংবৃত্তি কোথায় যে সে-প্রেরণাতে কাজ হবে?

—আপনার দুঃখকে আরও বাড়িয়ে দিলাম তাহ'লে আমি! দুর্ভাগ্য আমার! সকাতরে বললেন লুসী।

—না, না, এমন কথা বলবেন না। কেউ যদি আমায় উদ্ধার করতে পারতো—তাহ'লে সে আপনি। কিন্তু উদ্ধার হবার মত শক্তিই নেই আমার, সে আমি হারিয়ে ফেলেছি! দীর্ঘদিনের অনাচারের নীচে সে কোথায় চাপা প'ড়ে হারিয়ে গেছে। তাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়!

—আপনার কোন উপকারেই কি তাহ'লে আসতে পারি না আমি?

—আপনি ধৈর্য ধারণ ক'রে, সমবেদনার সঙ্গে এই অপদার্থ জীবের দুঃখের কথা শুনেছেন, এইতেই অপরিসীম উপকার করা হলো আমার। বিশ্বাস করুন মিস্ ম্যানেট, এই যে একান্ত নিরিবিলি আপনার কাছে আমার মনের গোপন ব্যথা জানাতে পেরেছি, এ



...কোনো কথাও কেউ আর শুনতে চাইলো না, অপরাধীর স্বপক্ষে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হলো।...

সৌভাগ্যের কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি মনে রাখব, চিরদিন এর স্মৃতি আমায় গভীর আনন্দ দেবে।···হ্যাঁ, এ আলাপন আপনি গোপনই রাখবেন ত’? আপনার কাছে ঐ আমার একটিমাত্র ভিক্ষা!

—অবশ্য।

—আপনার অতি প্রিয় ব্যক্তির···প্রিয়তমের কাছেও কোনদিন প্রকাশ করবেন না ত’ এ-কথা?

লুসী একটু ইতস্ততঃ ক’রে তারপর বললেন—আপনার গোপন কথা প্রকাশ করবার অধিকার আমার কি আছে? আপনি চিন্তা করবেন না। এ-কথা কেউ জানবে না।

—ধন্যবাদ! ভগবানের আশিস বর্ষিত হোক আপনার উপর।

বিদায় নিয়ে দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আবারও ফিরে দাঁড়ালো সিডনী। —আপনার ভয় নেই মিস্ ম্যানেট, এ-প্রসঙ্গের আলোচনা আর কখনো শুনতে পাবেন না আমার মুখে। আজও যে এ-কথা শুনতে পেলেন, সে শুধু আমি একটা প্রলোভন দমন করতে পারি নি ব’লে। কী প্রলোভন, বলবো? আমি সারা জীবন মনে মনে অনুভব করতে চাই যে, আমার গোপন-কথা আমারই অন্তরে শুধু নিবদ্ধ নেই, আমার গোপন-ব্যথা গোপনে বহন করবার জন্য আর-এক অংশীদার আছে আমার। আমার নাম, আমার অকীর্তি, আমার বিফল ভালোবাসার কাহিনী যে আপনার কোমল হৃদয়ের এক কোণে চিরদিনের জন্য একটু খানিও স্থান লাভ করলো, এ আমার পরম সৌভাগ্য কুমারী ম্যানেট, এ আমার আশাতীত আনন্দ!

কার্টনের যে মূর্তি এতদিন চোখে পড়েছে লুসীর, তার চেয়ে এতটাই আলাদা, এতখানি উঁচু তার আজকের এই মূর্তি, যে, তাকে বিদায় দেবার কালে একটা সান্ত্বনার কথাও বলবার পথ না পেয়ে লুসী ব্যথিত-হৃদয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। সিডনী দেখলো সে অশ্রু, দেখে বললো—কাঁদবেন না কুমারী ম্যানেট! কার জন্য কাঁদছেন? একটা অপদার্থ! একটা পশু! এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই যে

আবার তার অভ্যস্ত পাঁকের রাজ্যে নেমে যাবে! কার জন্য দুঃখ করছেন আপনি?—তবে হ্যাঁ, যতই নেমে যাই-না কেন, যে-নরকেই বাস করি না আমি, আপনার সেবার সুযোগ যদি কখনো পাই, প্রাণ দিয়েও আমি তা করবো—এ-কথা বিশ্বাস করুন কুমারী ম্যানেট! প্রাণ দিয়েও তা করবো আমি! আপনি সুখী হোন। আর, সর্ব-সুখের মাঝে যেন আপনার স্মরণ থাকে যে, আপনার সুখের পথের কাঁটা দূর করবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত একটা জীব ধরায় আছে, নাম তার—সিডনী কার্টন।

ছয় **ঝড় বুঝি উঠছে**

পাঁচ বৎসর পরে।

লণ্ডনে সোহো-পল্লীর এক গৃহে এক সুখী পরিবার। ডার্ণে লুসীকে বিয়ে করেছেন। লুসী ম্যানেট আজ লুসী ডার্ণে। তাঁদের একটি ছোট্ট মেয়েও হয়েছে, মায়ের নামে তাকে ডাকা হয় ছোট্ট লুসী বলে।—এই কয়টি মাত্র প্রাণী নিয়ে সেই ছোট্ট পরিবার। তবে হ্যাঁ, পরিবারভুক্ত না হয়েও এঁদের একটি অতি আপনজন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন—তিনি হলেন মিষ্টার লরী, টেলসন ব্যাঙ্কের কর্মাধ্যক্ষ।

আর এই পরিবারে মাঝে মাঝে দুই-এক ঘণ্টার জন্য একজন সুপরিচিত অতিথির দেখা মেলে, সে হচ্ছে সিডনী কার্টন, যার সঙ্গে ছিল ডার্ণের আশ্চর্য চেহারার মিল। বৎসরে তিন-চারবারের বেশী সে আসে না। এসেও ছোট্ট লুসী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বেশী কথা সে বলে না। দু'এক ঘণ্টা! তারপরেই সে চলে যায় আবার। দিন-দিন ধাপের পর ধাপ নেমে যাচ্ছে সে, তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যায়। মুখে ভদ্রতার অভাব না দেখিয়েও অন্তরে সবাই তাকে

তাচ্ছিল্য করে, শুধু এক লুসী ছাড়া। লুসীর হৃদয় বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে, সিডনীর বিবর্ণ মলিন মুখের দিকে চাইলেই।

ওদিকে প্যারী নগরে ডিফার্জের মদের দোকান আগের চাইতেও সরগরম। মাদার ডিফার্জের সেলাইয়ের বিরাম নেই। একা মাদাম ডিফার্জ নয় আবার! আজকাল ঐ দোকানের এক অংশে বহু নারী এসে সেলাই নিয়ে বসে। সংকেতে কথা হয়। গুপ্তচরের ভয়ে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। ডিফার্জ সদা সতর্ক!

একদিন গভীর রাত্রে।

দোকান বন্ধ ক'রে ডিফার্জ-দম্পতি চুপি চুপি কথা কইছে। স্বামী বলছে—আর কতদিন বলো দেখি? কতদিন আর অপেক্ষা করতে হবে এমনি ধারা?

স্ত্রী উত্তর দিচ্ছে—হয়তো বহুদিন! জমি তৈরি করার সময়টা দীর্ঘই হয়ে থাকে! ভূমিকম্পের কথা ভাবো! এক মিনিটে গোটা দেশটা ধ্বংস ক'রে দেয় সে। কিন্তু ভূমিকম্পের উপযোগী অবস্থা তৈরি হয় মানুষের চোখের আড়ালে দীর্ঘদিন ধ'রে। বজ্রপাতের কথা ভাবো! বাজ মাথায় পড়লে এক সেকেণ্ডে মানুষ মরে। কিন্তু বজ্রপাতের উপযোগী অবস্থার আবহাওয়া তৈরি হয় দীর্ঘদিন ধ'রে। আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি। একদিন বাজের মত পড়বো গিয়ে অত্যাচারীর মাথায়, ভূমিকম্পের মত এসে গুঁড়িয়ে দেবো অত্যাচারী বড়লোকদের সমস্ত শক্তি!

স্বামী বললে—একদিন? আমরা বেঁচে থাকতে-থাকতে আসবে কি সে-একদিন?

—নাই-বা এলো? প্রস্তুতি চলছে ত'! দেশের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে জ্যাক্‌স্-ভাইদের সংঘ গ'ড়ে উঠেছে। পুলিশে জ্যাক্‌স্, সেনাদলে জ্যাক্‌স্, দোকানে জ্যাক্‌স্, হোটেলে জ্যাক্‌স্। একদিন এক শুভ মুহূর্তে এরা মাথা নাড়া দিয়ে জেগে উঠবে সবাই, অত্যাচারী রাজার সিংহাসন টলমল ক'রে কেঁপে মাটিতে প'ড়ে চুরমার হয়ে যাবে অমনি। প্রতীক্ষা করো।

প্রতীক্ষা আর বেশী দিন করতে হলো না। বাসুকীর সহস্র ফণা তুলে উঠলো একদিন প্রভাতে! ধরণী কেঁপে উঠলো থর্-থর্... থর্...থর্...

রোগা, শুক্নো দাঁড়কাক যেন হাজারে-হাজারে উড়ছে—ডিফার্জের দোকানের চারিপাশে। কিন্তু এরা দাঁড়কাক নয়, মানুষ। এদের মাথার উপর ইস্পাতের ঝিলিক খেলে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। যে-কোন অস্ত্র হাতের কাছে পেয়েছে, তাই নিয়ে ছুটে এসেছে এরা। সারা সেন্ট আণ্টইন-পাড়া এক সুরে গর্জন করছে, হাতিয়ার তুলে হাজারে-হাজারে অনাবৃত বাহু বাতাসে দুলছে—শীতের দিনে পাতাঝরা অরণ্যে মলিন কালো বৃক্ষশাখার মত!

হাতে হাতে অস্ত্র, হাজারে হাজারে! কোথা থেকে এলো এত অস্ত্র? কেউ বলতে পারে না—কোথা থেকে এলো। কিন্তু এসেছে তারা...অজানা লোকেরা বিতরণ করেছে সেই অস্ত্র ভিড়ের ভিতর। বন্দুক, কার্তুজ, বারুদ, লোহার ডাণ্ডা, বাঁশের লাঠি, কাঠের মুগুর, ছুরি, কাটারি, কোদাল, কুড়াল—আঘাত করবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, এমন কোন জিনিসই বাদ পড়ে নি। যাদের ভাগে কোন হাতিয়ার পড়লো না, তারা রাস্তা খুঁড়ে পাথর আর ইঁট তুলতে লাগলো। সেন্ট আণ্টইনের প্রত্যেকটা লোকের মাথায় বিকার চেপেছে, বিকারের রোগীর মতই দপ্‌দপ্ করছে তাদের নাড়ী, জ্বল্‌জ্বল্ করছে তাদের টকটকে লাল চোখ। জীবনটাকে সবাই মনে করছে খেলার বস্তু, আর সে খেলার বস্তুটাকে গুঁড়ো ক'রে ভেঙে ফেলবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এই হাজার হাজার লোক—যারা দাঁড়কাকের মত এসে ভিড় করেছে ডিফার্জের দোকানের সমুখে, এই সাংঘাতিক সকালবেলায়।

দাঁড়কাকেরা ঘুরছে ডিফার্জকে কেন্দ্র ক'রে। ধ্বংসের এই মহা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত সে। অস্ত্রবিতরণে ডিফার্জ, আদেশদানে ডিফার্জ, সকল ব্যাপারে ডিফার্জ! কাউকে পিছনে হটিয়ে দিচ্ছে, কাউকে সমুখে টেনে আনছে, কাউকে অস্ত্র দিচ্ছে, কারুর অস্ত্র কেড়ে

নিচ্ছে, হুকুম দিচ্ছে, শাসন করছে, উপদেশ দিচ্ছে, মিনতি করছে—সারা গায়ে বারুদ আর ঘাম, চরকির মত ঘুরছে অনবরত।

—তিন নম্বর জ্যাক্‌স্‌, তুমি আমার কাছে থাক!—এই ব'লে সে চীৎকার ক'রে উঠলো—এক নম্বর আর তু'নম্বর জ্যাক্‌স্‌—তোমরা এক-একটা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করো, এগিয়ে গিয়ে! আমার স্ত্রী কোথায়? আমার স্ত্রী?···মাদাম ডিফার্জের উত্তর শুনতে পাওয়া গেল কাছেই! মাদাম ডিফার্জ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজ আর তাঁর হাতে সেলাই নেই, তার বদলে আছে একখানা কুঠার। কোমরবন্ধে একখানা বাঁকা ছোরা, আর একটা গুলিভরা পিস্তল। ডিফার্জ জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কোন্ দিকে যেতে চাও?

—উপস্থিত তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। কিন্তু আমি নেবো মেয়েদের দলের নেতৃত্ব। সয়তানদের হত্যা করার কাজে মেয়েরা কি অক্ষম?

বজ্রনাদে চীৎকার ক'রে উঠলো ডিফার্জ—দেশপ্রেমিক বান্ধবেরা! আমরা প্রস্তুত। চলো—ব্যাষ্টিলে চলো!

একটা গর্জন উঠলো বহু সহস্র কণ্ঠ থেকে। সেই বিরাট জনতা ছুটলো এবার, যেন কূল ছাপিয়ে সমুদ্র ছুটলো তরঙ্গে-তরঙ্গে। সমগ্র নগরী প্লাবিত, মগ্ন হয়ে গেল সেই তরঙ্গের নীচে। গির্জায়-গির্জায় বাজছে আতঙ্কের ঘণ্টা, জয়ঢাক বাজছে তোরণে-তোরণে, উদ্বেল সমুদ্র ধেয়ে গিয়ে ভেঙে পড়লো ব্যাষ্টিল-কারাতুর্গের পাঁচিলের ওপর।

গভীর পরিখা ব্যাষ্টিলের চারিপাশে। একটার পর একটা টানা-সেতু—নীরেট পাথরের প্রশস্ত দেওয়াল, তার মাথায় আটটা গুম্বজ,—গুম্বজে-গুম্বজে কামান, বন্দুক, আগুন, বিস্ফোরক! মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে আগুন আর ধোঁয়ার ভিতর এগিয়ে চললো পাগল জনতা, আগুন আর ধোঁয়া অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গিয়ে গুম্বজে-গুম্বজে কামান নিলো দখল ক'রে।

মদের দোকানী ডিফার্জ চোখের পলকে গোলন্দাজ হয়ে দাঁড়ালো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কামান দাগতে লাগলো ব্যাষ্টিলের তুর্গপ্রাচীরে।

গভীর পরিখা পার হয়ে, টানা-সেতু উত্তীর্ণ হয়ে, নীরেট পাথরের দেয়াল টপ্‌কে, গুম্বজে-গুম্বজে কামানের পাশে দাঁড়ালো গিয়ে বিরাট্ জনসমুদ্র। ডিফার্জ গর্জন করে ওঠে থেকে থেকে—কম্‌রেড্‌রা! বিশ্রাম নেই···শত্রু মারো! এগিয়ে চলো ব্যাষ্টিলের মাঝখানে! জ্যাক্‌স্ নম্বর এক! জ্যাক্‌স্ নম্বর দুই! জ্যাক্‌স্ নম্বর এক হাজার! জ্যাক্‌স্ নম্বর দু' হাজার! জ্যাক্‌স্ নম্বর পঁচিশ হাজার! ভগবানের ভক্ত, ভগবানকে ডেকে নাও! সয়তানের যে সঙ্গী, সয়তানকে সে স্মরণ কর! এগিয়ে চলো বন্ধু! এগিয়ে চলো! শত্রু মারো!

কামান, বন্দুক, আগুন আর ধোঁয়া। সেতুর পর সেতু পেরিয়ে, পরিখার পর পরিখা উত্তীর্ণ হয়ে, গুম্বজের পর গুম্বজে চ'ড়ে, নীরেট দেয়ালের মাথায় গিয়ে ওঠে বিরাট্ জনসমুদ্র। অস্ত্রের মুখে রৌদ্র জ্বলে ঝক্‌-ঝক্! মশালের মুখে আগুন জ্বলে জ্বল্‌-জ্বল্! খড়ের গাদায় সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে আগুন আর ধোঁয়া! আর্তনাদ, অভিশাপ, গোলাবৃষ্টি—বিরাট্ জনসমুদ্র এগিয়ে চলে ব্যাষ্টিলের কেন্দ্রস্থলে। উথলে ওঠে জনসমুদ্রের তরঙ্গ, চিরতরে ডুবে যায় ফরাসীদেশের অত্যাচারী রাজতন্ত্র! নিরুপায় দেখে দুর্গরক্ষীরা সাদা নিশান উড়িয়ে সন্ধির প্রার্থনা জানালো!

ঝড়ের বেগে ধেয়ে যায় জনতা, তার মাথার উপর চকিতে উড়লো একবার সেই শ্বেতপতাকা, অমনি উল্লাসে গর্জন ক'রে প্রাচীরের মাথার দিকে ছুটলো জনতা, যেন আকাশপানে লাফিয়ে উঠল সমুদ্রের তরঙ্গ। সেই তরঙ্গদোলার মাথায় চ'ড়ে ডিফার্জ আর তার সঙ্গীরা গিয়ে পড়লো ব্যাষ্টিলের মাঝখানে। একজন প্রহরীকে সমুখে দেখে তার গলার কলার চেপে ধরলো ডিফার্জ:

—১০৫, নর্থ টাওয়ার, জিনিসটা কি?

ভীত ত্রস্ত প্রহরী বুঝতে পারলো না—১০৫?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা কি কোন বন্দীর নাম? ১০৫, নর্থ টাওয়ার?

—ও একটা কারা-গহ্বরের নাম!

—দেখাও সেটা!

ঘুরতে-ঘুরতে কক্ষের পর কক্ষ, সিঁড়ির পর সিঁড়ি, দ্বারের পর দ্বার, সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ অতিক্রম ক'রে চললো প্রহরীর পিছনে-পিছনে ডিফার্জ আর তিন নম্বর জ্যাক্‌স্! অবশেষে ছোট একটা গর্ত! কক্ষ বলা ভুল তাকে। যেন পাথরের ভিতর খোদাই ক'রে বার করা হয়েছে একটা গর্ত! একটা মাত্র জানালা, তাতে মোটা-মোটা লোহার গরাদে!

সেই ঘরের দেয়ালে ডিফার্জ দেখে, তখনও রয়েছে একটা নাম লেখা, আঁচড় কেটে-কেটে। ডিফার্জ পড়লো—আলেকজাণ্ডার ম্যানেট্‌!

সেই গর্তের মেঝে খুঁড়ে, চিমনী ভেঙে, লোহার খাট আর টুল উল্টেপাল্টে তালাসী করলো ডিফার্জ। হ্যাঁ, পেলো বইকি! চিমনীর কোন্‌ ফাঁকে সে আবিষ্কার করলো একতাড়া কাগজ!

তারপর তারা বেরিয়ে পড়লো, ১০৫ নম্বর নর্থ টাওয়ার থেকে। প্রাঙ্গণে তখন ডিফার্জের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। ডিফার্জ এসে আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করলো সেই বিরাট্‌ জনসমুদ্রের। ১০৫-এর মতই ছোট-ছোট গর্ত থেকে সাতজন বন্দীকে করা হলো মুক্ত! আর ব্যাষ্টিলের সব-চেয়ে মজবুত, সব-চেয়ে উঁচু গুম্বজ থেকে ধ'রে আনা হলো সাতজন উঁচুদরের রাজকর্মচারীকে!

তারপর সেই সাতজন বন্দীকে কাঁধে ক'রে নিয়ে বেরুলো সেই বিরাট্‌ জনতা—ব্যাষ্টিলের কারাদুর্গ থেকে। কাঁধে তাদের সাতজন মুক্ত রাজবন্দী, আর সেই জনসমুদ্রের মাথার উপর উঁচু-বাঁশে-বসানো সাতটি রক্তঝরা নরমুণ্ড! সেই অত্যাচারী সাতজন রাজকর্মচারীর সদ্য-কেটে-আনা মুণ্ড! যুগের পর যুগ অত্যাচারিত, অপমানিত জনতার সেই পাগল প্রতিহিংসা রক্তের অক্ষরে লেখা রয়ে গেল মানুষের ইতিহাসে। যুগ পাল্‌টে গেল।

* * *

এই যুগ-পাল্‌টানো ঘটনার অল্প পরেই একদিন টেলসন ব্যাঙ্কের লণ্ডন অফিসে কথা হচ্ছিলো মিষ্টার লরীর সঙ্গে চার্লস্‌ ডার্ণের। ব্যাঙ্কের প্যারী-শাখার কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলার দরকার হয়েছে।

সেখানে আর কারবার চলছে না। কাগজপত্র যথাসম্ভব নিয়ে আসতে হবে লণ্ডন অফিসে। সব হয়ত নিয়ে আসা সম্ভব হবে না—কারণ ফরাসী সীমান্তে কড়া পাহারা বসিয়েছে বিদ্রোহীরা। যা নিয়ে আসার উপায় নেই, তা লুকিয়ে রেখে, বা নষ্ট ক'রে দিয়ে আসতে হবে। এ গুরুভার কাজের জন্য মিষ্টার লরীকে ছু'চার দিনের জন্য যেতেই হবে প্যরীতে একবার। ডার্ণেকে ডেকে পাঠিয়েছেন লরী এই সংবাদই দেবার জন্য। ডার্ণে ও ম্যানেটকে না জানিয়ে লরী যেতে পারেন না, কারণ, ওঁরাই এখন লরীর একমাত্র আপনার জন পৃথিবীতে।

লরী এ-সময়ে প্যারী যাবেন শুনেই ডার্ণের চক্ষুস্থির! প্যারী যাবেন? যে-প্যারীতে এখন মৃত্যুর প্রলয়নাচ চলেছে চব্বিশ ঘণ্টা? যে প্যারী ছেড়ে পালাবার জন্য ব্যগ্র সবাই? ফ্রান্সের রাজা-রাণী বন্দী! জমিদার ও ভূতপূর্ব শাসকেরা—যে পেরেছে, সেই পালিয়েছে। যে পারে নি সে গিলোটিনে প্রাণ দিয়েছে। গিলোটিন—বড়লোকদের মাথা কাটবার জন্য বিদ্রোহীরা নতুন কল তৈরি করেছে ঐ গিলোটিন! খ্যাঁচ্, খ্যাঁচ্—অস্ত্র পড়ছে অপরাধীর শিরে, একের পর এক! মাথার পর মাথা লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচেকার ঝুড়ির ভিতর! এই গিলোটিনে দৈনিক ছুশো-একশো লোক প্রাণ দিচ্ছে। বিদ্রোহীদের অবিশ্বাস বা সন্দেহভাজন যে, তার আর নিস্তার নেই গিলোটিন থেকে। যে কেউ একটা যেমন তেমন অভিযোগ করলেই হলো। সঙ্গে-সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তি বন্দী হবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার বিচার হবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে গিলোটিন।

কিন্তু ডার্ণের সমস্ত প্রতিবাদ, সমস্ত অনুনয় ব্যর্থ হয়ে গেল। লরী এতকাল টেলসন ব্যাঙ্কের নিমক খেয়েছেন, এখন তিনি গিলোটিনের ভয়ে ব্যাঙ্কের কাজে অবহেলা করবেন? বিশেষ ক'রে লরী হলেন ইংরেজ, হঠাৎ কোন ইংরেজকে গিলোটিনে পাঠাতে ফরাসী-বিদ্রোহীরাও সাহস পাবে না।

লরী সেইদিনই রাত্রে রওনা হবেন। মনস্থির করে ফেলেছেন একেবারে।

লরীকে নিরস্ত করতে না পেরে ডার্ণের বড়ই চিন্তা আর ভয় হলো তাঁর জন্য। কিন্তু উপায় ত' নেই! তিনি চলে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে ব্যাঙ্কের মালিকদের ভিতরই একজন এসে লরীর হাতে দিলেন—একটা চিঠি। চিঠির খামখানা নোংরা হয়ে গেছে, যেন বহু হাত ঘুরে এসেছে সে। লরী চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন —না, মহাশয়! বহু খোঁজই ত' করা হলো। এ-নামের কাউকে দেখতে পাই না!

ফরাসীদেশ থেকে কিছুদিন ধ'রে নিত্যই নতুন-নতুন লোক পালিয়ে আসছে ইংলণ্ডে। জমিদার, সামরিক-কর্মচারী, মন্ত্রী, ম্যাজিষ্ট্রেট—সবাই পালিয়ে আসছেন প্রাণ হাতে ক'রে। এঁরা সবাই প্রায় একবার ক'রে টেলসন ব্যাঙ্কের লণ্ডন অফিসে দেখা দিয়ে যান। অনেকের হিসাব আছে এ-ব্যাঙ্কে। অনেকের ছিল, এখন নেই, কিন্তু পূর্বের খাতিরে ধার পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। কেউ আবার আসেন—পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে, এই আশায়। ফরাসীদেশের লোকমাত্রেই জানে—পলাতক-ফরাসীদের আড্ডা লণ্ডনে ঐ একটিই আছে—টেলসন ব্যাঙ্কের অফিস। তাই কোন পলাতক-ফরাসীকে পত্র লিখতে হ'লে ফ্রান্সবাসী ফরাসীরা টেলসনের ঠিকানাতেই পত্র দেয়। লরীর হাতের চিঠিখানাও ঐ জাতীয় একখানা চিঠি! লরী মাথা নাড়লেন—না, রোজই ত' খোঁজ করা যাচ্ছে। এ-নামের কাউকে দেখতে পাই না।

চিঠিখানা টেবিলের উপর প'ড়ে আছে। ডার্ণে শিরোনামাটা পড়লেন। তাঁর বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধক্ ক'রে লাফিয়ে উঠলো। মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেল। নাম লেখা আছে—মার্কুইস এভ্রিমণ্ডি।

মার্কুইস এভ্রিমণ্ডি? সে ত' ডার্ণে! ফরাসীদেশে ত' ডার্ণের ঐ নাম! গুপ্তহন্তার হাতে তাঁর পিতৃব্য খুন হওয়ার পরে ডার্ণেই ত' এখন মার্কুইস বা জমিদার! সে অভিশপ্ত নামের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না বলেই ডার্ণে ইংলণ্ডে নিজেকে ডার্ণে নামে পরিচিত

করেছেন। কিন্তু এখন—কে তাঁকে চিঠি লিখলো পিছনে-ফেলে-আসা ফরাসীদেশ থেকে?

ডার্ণে লরীকে বললেন—এভ্‌রিমণ্ডি? ভদ্রলোকটি আমার পরিচিত! চিঠিখানি যদি আমায় দেন, আমি দিয়ে দিতে পারবো।

লরী খুশী হয়েই পত্র দিয়ে দিলেন ডার্ণেকে।

ডার্ণের প্রকৃত নাম ডাক্তার ম্যানেট ভিন্ন কেউ জানে না। ম্যানেটও জেনেছিলেন সবে লুসীর বিবাহের দিন। জেনেই তাঁর প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল বিবাহ ভেঙে দেওয়ার। কিন্তু তা তিনি পারেন নি, লুসীর মুখ চেয়ে। লুসী যে ভালোবাসে ডার্ণেকে! তাই পরম শত্রুর পুত্রকে তিনি জামাতা ব'লে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ডার্ণেকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—তিনি যেন নিজের আসল নাম লুসীকে বা লরীকে না বলেন।

ডার্ণে পত্র প'ড়ে দেখলেন—তাঁর ফরাসীদেশের কর্মচারী গ্যাবেল লিখেছে চিঠি। এভ্‌রিমণ্ডি-জমিদারীর গোমস্তা ব'লে, সে বন্দী হয়েছে, শীঘ্রই তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তাকে বাঁচাতে হ'লে, এভ্‌রিমণ্ডি-মার্কুইসের অবিলম্বে ফ্রান্সে যাওয়া প্রয়োজন। তা নইলে প্রভুর অপরাধে ভৃত্য প্রাণ হারাবে!

সাত

প্রলয়-দোলা

মিষ্টার লরী ইংরেজ, সুতরাং ফরাসীদেশের প্রলয়-দোলার মাঝখানেও তিনি খানিকটা নিরাপদ। গৃহবিবাদের সময়—বিদেশী লোকের উপর অত্যাচার পারতপক্ষে কেউ করে না। আইনে ওটা নিষেধ আছে। লরী প্যারীর অফিসে ব'সে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন, কেউ তাঁর উপর উৎপাত করতে এলো না। টাকা-পয়সা আগে থাকতেই লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল—যতটা সম্ভব!

কাগজপত্র কতক মাটির তলায় পুঁতে ফেললেন লরী, কতক বা ফেললেন পুড়িয়ে। সীমান্তে পাহারার যা কড়াকড়ি, তাতে এক টুকরো হিসাবের কাগজও যে ফ্রান্স থেকে বের ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে, সে-ভরসা তিনি করতে পারলেন না।

ব্যাঙ্কেরই একাংশে বাস করছেন মিষ্টার লরী। বাড়ীর ভিতরটা নির্জন। বাসিন্দা যারা ছিল, তারা পালিয়েছে। প্যারীর অনেক মহল্লাই এখন এমনি নির্জন। একটা প্রকাণ্ড শান-যন্ত্র বসানো রয়েছে বাড়ীর উঠানে। সেখানে অবিরত অস্ত্রে শান দেওয়া চলেছে। শত-শত লোক আসছে আর যাচ্ছে। সকলেরই হাতে কোন-না-কোন অস্ত্র। মানুষ কেটে-কেটে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে অস্ত্র, আর অমনি ছুটে আসছে তারা শান দেওয়ার জন্য। তরোয়াল, কোদাল, কুড়াল, ছুরি, ছোরা! যারা আসছে, তাদের হাতে রক্ত, কাপড়ে রক্ত, হাতিয়ারে রক্ত...

রাত্রে লরী ঘরের ভিতর ব'সে ভগবানের নাম স্মরণ করছেন। উঃ! সর্বরক্ষা যে, এই মহা-নরকে আমার কোন প্রিয়জন আজ নেই! ভগবানকে ধন্যবাদ! হঠাৎ তাঁর অফিস-ঘরের কড়া নড়ে উঠলো। সাবধানে দ্বার খুললেন লরী। হয়তো কোন তুর্ভাগ্য মক্কেল। রাত্রির অন্ধকারে টাকা নিতে এসেছে। পালাবার কোন উপায় করতে পেরেছে হয়তো। এখন টাকাটা পেলেই ত্যাগ করতে পারে এই অভিশপ্তপুরী। লরী এমন অনেককেই দিয়েছেন টাকা গভীর রাত্রে। ব্যাঙ্কেরই টাকা অবশ্য। ব্যাঙ্কে টাকা কতদূর কী জমা আছে অভাগা মক্কেলের, তা না দেখেই টাকা দিতে হয়েছে তাঁকে।

কিন্তু এ কারা? মক্কেল ত' নয়! লরীর চোখের সমুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো! লুসী? ডাক্তার ম্যানেট? লুসীর মেয়ে?—এইমাত্র না তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন যে, তাঁর কোনও প্রিয়জন—হা ঈশ্বর! এমন নিষ্ঠুর পরিহাস কি করতে আছে কারো সঙ্গে?

ওরা ছুটে ঘরে ঢুকলো এসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো নিজেদের কাহিনী! লরী যেদিন চলে এলেন, তার পরদিন ডার্ণেও

—কী একটা চিঠি পেয়েছিলেন নাকি ডার্ণে, ফ্রান্স থেকে ! কার নাকি জীবন রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল ডার্ণের ফ্রান্সে আসবার। কাউকে কিছু বলেন নি ডার্ণে। লুসীর নামে একখানা পত্র লিখে রেখে, "বেড়াতে যাচ্চি একটু"—ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। চিঠি পেয়েই ডাক্তার ম্যানেট ছুটে এসেছেন। তিনি জানেন ডার্ণের প্রকৃত পরিচয়। বিদ্রোহী ফরাসী, রক্ত-পাগল ফরাসী-জনসাধারণের হাতে পড়লে চিরদিনের অত্যাচারী এভ্‌রিমণ্ডি-জমিদারের যে নিশ্চয়ই প্রাণ যাবে, তা বুঝতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছেন ডাক্তার ম্যানেট ! ডাক্তার ম্যানেট লুসীকে আনতে চান নি কোনমতেই, কিন্তু সে কি প'ড়ে থাকতে চায় ? স্বামী যেখানে শত্রুর হাতে মরতে বসেছে, পতিব্রতা পত্নী কি সেখানে দূরে ব'সে থাকতে পারে, নিজের জীবনটাকে নিরাপদ রাখবার জন্য ?

সব শুনে লরী কপালে করাঘাত ক'রে হতাশভাবে বললেন—কিন্তু তুমি যে ছুটে এলে ম্যানেট, কী করতে পারবে তুমি ? ডার্ণেকে বাঁচাবার কতটুকু শক্তি আছে তোমার ?

—তা আছে।—একটু গর্বের সঙ্গেই ম্যানেট বললেন—তা কিছু আছে ! কারণ, আমি আঠারো বৎসর বন্দী ছিলাম ব্যাষ্টিলে। আমার নাম সবাই জানে—আজকের এই বিদ্রোহীরা। আমার খাতির এরা করবে। ইতিমধ্যেই খাতির পেয়েছি। ডার্ণের খবর আমি সীমান্তের অফিসে বসেই সংগ্রহ করতে পেরেছি। অন্য কেউ সে খবরটাই যোগাড় করতে পারত না।

লরী বললেন—কী খবর ? কী খবর পেয়েছো ?

—ডার্ণেকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে লা-ফোর্সে'র কারাগারে।

লরী শিউরে উঠলেন—লা ফোর্সে'র কারাগারে ? সেখান থেকে ত' জীবন্ত বেরিয়ে আসতে কাউকে দেখলাম না এ-কয় দিনে। তোমার যদি কিছু করতে হয় ত'—এক্ষুণি, ডাক্তার ! হয়তো এখনও সময় থাকতেও পারে ! যদি কিছু উপায় তুমি করতে পারো, তবে তা এক্ষুনি করো ডাক্তার ! কাল হয়তো দেখবে যে,

সব ফুরিয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা বেশী সময় নেয় না। কেউ একজন অভিযোগ করলেই হলো যে, এ-লোকের দ্বারা জনসাধারণের উপর অত্যাচার হয়েছে। জজ আর জুরী বসেই আছে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য। গিলোটিন পাতাই আছে! যাও, যাও ডাক্তার! লুসী এখানেই থাকুক, তুমি দেখ কি করতে পারো!

বাইরের উঠানে কয়েক শত লোক অস্ত্রে শান দিচ্ছলো তখনো, —রক্তরাঙা অস্ত্র···রক্তরাঙা মানুষ! সেই কয়েক শত লোকের ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়লেন শুক্লকেশ ম্যানেট! অফিস-ঘরের দরজা একটুখানি খুলে লরী দেখতে লাগলেন—ম্যানেট কি-যেন-কি কথা কইছেন সেই ভিড়ে দাঁড়িয়ে! সহসা সেই ভিড় চীৎকার করে উঠলো—ব্যাষ্টিলের বন্দী ম্যানেট, দীর্ঘজীবী হোন্! ব্যাষ্টিল-বন্দীর আত্মীয় এভ্রিমণ্ডিকে চাই আমরা। মুক্ত করো ব্যাষ্টিল-বন্দীর আত্মীয়কে। চলো সবাই লা-ফোর্সে! চলো সবাই লা-ফোর্সে!

সেই কয়েক শত লোক ডাক্তার ম্যানেটকে কাঁধে করে নিয়ে ছুটে চললো লা-ফোর্সে। লুসী আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভূতলে জানু পেতে ব'সে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন ভগবানকে। লরীরও আশা না হলো তা নয়, কিন্তু তিনি জানেন—বন্দীকে খালাস করে আনা কত কঠিন আজকের দিনে! বেশী আশা করতে সাহস হলো না তাঁর।

চার দিন পরে ফিরে এলেন ম্যানেট। লরীর সঙ্গে গোপনে আলাপ হলো তাঁর। জনতা তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল লা-ফোর্সে। সারা দীর্ঘপথ রক্তে পিছল···মড়ার গাদা চারিদিকে। জনসাধারণ হত্যা করেছে জনসাধারণের শত্রুদের। কারার ভিতরেও চলেছে হত্যাকাণ্ড। বিচারসভা বসেছে কারার ভিতর। বিচারকেরা গায়ের জোরেই বিচারক হয়ে বসেছে। তাদের সম্মুখে বন্দীরা আনীত হচ্ছে একটি-একটি করে। বেশীর ভাগ বন্দীকে সঙ্গে-সঙ্গেই সঁপে দেওয়া হচ্ছে জনতার হাতে, তারা সঙ্গে-সঙ্গেই টুকরো করে কেটে ফেলছে তাদের। দু'চার জন মুক্তিও পাচ্ছে। দু'একজনকে

আবার ফেরত পাঠানো হচ্ছে কারাগারে। ম্যানেট এই বিচারসভার সমুখে গিয়ে পরিচয় দিলেন নিজের। তাঁকে জানে সবাই। জুরীর ভিতর বসেছিল তাঁর সেকালের এক ভৃত্য, নাম তার ডিফার্জ।

তিনি শুনতে পেলেন—ডার্ণে তখনও জীবিত। সেই স্বয়ং-নিযুক্ত আদালতের সমুখে তিনি জামাতার স্বপক্ষে অনেক কিছুই বললেন—প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে! ম্যানেটের আঠারো-বৎসর ব্যাষ্টিল-বাসের কাহিনী যে শুনেছে, সেই বলেছে—ডার্ণের মুক্তি পাওয়া উচিত। ডাক্তার আশা করছেন প্রতি মুহূর্তে যে, এইবার সে-মুক্তির আদেশ দেওয়া হবে, এমন সময়ে কেমন করে যেন হাওয়া বদলে গেল একেবারে। জুরীদের ভিতর কানাঘুষা চললো কিছুক্ষণ, তারপর আদেশ হলো—মুক্তি এখন হতে পারে না এভ্‌রিমণ্ডির, তবে তাকে কারাগারে নিরাপদে রক্ষা করা হবে, জনতার হাতে তুলে দেওয়া হবে না তাকে। ডার্ণেকে সঙ্গে সঙ্গে আবার কারাগারের ভিতরে চালান করে দেওয়া হলো। ডাক্তার তখন সকাতরে প্রার্থনা করলেন—তাঁকে সেইখানে থাকতে দেওয়া হোক, যতক্ষণ-না উন্মত্ত জনতা কারাগার ছেড়ে চলে যায়। তারা গেল চার দিন পরে। এই চার দিন ডাক্তারকে লা-ফোর্সে থেকে পাহারা দিতে হয়েছে—যাতে কারাগারের ভিতর থেকে ডার্ণেকে টেনে বের করে হত্যা না করে রক্তপাগল জনতা।

এই চার দিনের ভিতর লরী একটা বাসা ঠিক করেছেন লুসীদের জন্য। লুসী ও ম্যানেট সেইখানেই বাস করতে লাগলেন। ডার্ণে কবে মুক্তি পাবেন, স্থির নেই। মুক্তি পেলে ফ্রান্স ত্যাগ করে যাওয়া এখন কখনোই সম্ভব হবে না ডার্ণের পক্ষে। কাজেই দীর্ঘদিন সকলের প্যারীতে থাকতে হবে হয়তো।

দেখতে দেখতে ডাক্তার ম্যানেটের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চিকিৎসক হিসাবে। বিদ্রোহী নেতারা তাঁকে লা-ফোর্সে ও অন্য তিনটে কারাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত করল। শুধু চিকিৎসক

বলে নয়, আগের দিনের ব্যাষ্টিল-বন্দী বলে তিনি এই কাজ পেলেন। তার ফলে ডার্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে লাগলো তাঁর মাঝে-মাঝে। লুসীকে পত্র দেবার সুযোগও পেলেন ডার্ণে, ম্যানেটের হাত দিয়ে। দীর্ঘ এক বৎসর কেটে গেল এইভাবে। না হলো ডার্ণের মুক্তি, না হলো তাঁর বিচার। ম্যানেট এখন আর লুসী বা লরীর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নন, বরং তাঁর উপর নির্ভর করেই এঁরা সবাই বাস করছেন প্যারীতে। আজ ম্যানেটের যেমন সম্মান, তেমনি তাঁর কাজের শক্তি, আর তেমনি তাঁর মনের জোর। এক বৎসর কেটে গেল। ডার্ণের মুক্তির জন্য ম্যানেটের চেষ্টার বিরাম নেই। কিন্তু মুক্তির কথা ত' পরে, বিচারের ব্যবস্থা পর্যন্ত হলো না অভাগা বন্দীর। ও-রকম তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কই নতুন শাসকদের? নতুন যুগের ঢেউ এসেছে দেশে। রাজার বিচার করা হয়েছে, রাজার উপর মৃত্যুদণ্ড প্রচার হয়েছে, রাজশির ছিন্ন হয়েছে ঘাতকের আঘাতে। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফরাসীদেশে, সে-তন্ত্রের মূল নীতি হলো, "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, আর তার অভাবে মৃত্যু।" সারা পৃথিবী ভয় পেয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে এই নতুন সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্র, কারও ভয়ে ভীত নয়, কারও ভ্রূকুটি দেখে নিরস্ত হবার পাত্র নয়। "হয় জয়, নয় মৃত্যু"—তার পণ! নোতরদামের গির্জার আকাশচুম্বী চূড়ায় দিবানিশি উড়ছে কৃষ্ণপতাকা! পৃথিবীতে যে যেখানে অত্যাচারী আছে, তাদের সমূলে বিনাশ করবার জন্য তিন লক্ষ ক্ষুধার্ত, চিরদিন পদদলিত লোক লাফিয়ে উঠেছে ফরাসীদেশের প্রতি গ্রাম ও নগর থেকে। যেন দৈত্যের পাল গর্জন ক'রে বেরিয়ে পড়েছে পাহাড় ও সমতল, পাথর ও বালুকা, লোকালয় ও অরণ্য থেকে। দক্ষিণের রৌদ্র-ঝলমল আকাশের নীচে, আর মেঘ-ঢাকা উত্তর-ফ্রান্সের আকাশের নীচে দ্রাক্ষা ও জলপাইয়ের আবাদে, আর শস্যহীন ক্ষেত্রের নাড়াবনে, নদীতীরে আর সাগর-উপকূলে—সর্বত্র জেগেছে পালে-পালে দৈত্য—

রক্ত-পিপাসায় লকলক জিহ্বা মেলে দিকে দিকে ছুটেছে তারা। সারা দেশে ছুটেছে ধ্বংসের বন্যা। তুচ্ছ ডার্ণের কথা ভেসে গেল সে-প্লাবনের মুখে!

ও কী ও? রাজার ছিন্ন মুণ্ড! ও কী আবার? রাণীর ছিন্ন শির! তরুণী রাণীর শিরে সাদা চুল এলো কোথা থেকে? সেই সুন্দরী লাবণ্যময়ী যৌবনবতী নারীর শিরে? হাঃ হাঃ, কেশ শুক্ল হতে কি বেশী সময় লাগে? রাজার মৃত্যুর পরে নয় মাস বেঁচে ছিলেন রাণী। সেই নয় মাসের প্রতি মুহূর্তে তাঁকে সইতে হয়েছে দারুণ অপমান, চরম অপমানের আশঙ্কা—যুবতীর কালো চুল সেই আশঙ্কাতেই অকালে সাদা হয়ে গিয়েছে।

সব ভেঙ্গে চুরে যাচ্ছে! ওলট-পালট হয়ে যার্চ্ছে সব! সব কিছু ধেয়ে চলেছে ধ্বংসের মুখে। গোটা দেশটার উপর ঘন হয়ে নেমে এসেছে মরণের কালো ছায়া! সে ছায়া গিলোটিনের। আগে লোকে শপথ করবার জন্য ক্রশের চিহ্ন করতো, এখন করে, গিলোটিনের। গিলোটিনের ছবি সকল ঘরে, গিলোটিনের ক্ষুদে ছবি সকলের জামার বুকে! এক-একটা মুণ্ড কেটে ফ্যালে এক-এক মিনিটে···অত দ্রুত হাত চালাতে কোন জল্লাদ কোনদিন পারে নি।

নদীতে ডুবিয়ে মারা, লাইন করে দাঁড়-করিয়ে গুলি করে মারা —এ-সবও কি নেই? তাও আছে···সর্বত্র মৃত্যু! মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে এক বছরের উপর। ডার্ণে পড়ে আছেন কারাগারে, লুসী পড়ে আছেন শিশুকন্যা নিয়ে লরীর তত্ত্বধানে, আর ম্যানেট ঘুরছেন বন্দীদের তদারক করে।

অবশেষে ডাক্তার একদিন সংবাদ নিয়ে এলেন—দীর্ঘ প্রতীক্ষা অবসান, কাল হবে ডার্ণের বিচার।

* * *

মুক্তি! মুক্তি! দীর্ঘ প্রত্যাশার পরে, দীর্ঘদিন সংশয়-দোলায় দোলবার পরে, ডার্ণে পেয়েছেন মুক্তি! ডাক্তার ম্যানেটের করুণ

ইতিহাস, অষ্টাদশবর্ষ ব্যাষ্টিল-বাসের শোকাবহ কাহিনী, এ সব শুনে জনসাধারণের মনে জেগেছে গভীর সহানুভূতি। তাই জজ আর জুরীর মুখ থেকে প্রচারিত হয়েছে জনসাধারণের ইচ্ছা··· ডার্ণে মুক্ত।

সেদিন কী আনন্দ ডাক্তার ম্যানেটের গৃহে! মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে এসেছেন প্রিয়তম ; লুসী চোখে জল, অধরে হাসি নিয়ে, নতজানু হয়ে বসেছেন ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতে। বহুদিন অদর্শনের পর পিতার দর্শন পেয়ে শিশু লুসী মুখরা হয়ে উঠেছে কলকাকলী তুলে। ম্যানেটের মুখে স্নিগ্ধ হাসি, আত্মপ্রসাদে তাঁর চিত্ত উঠেছে ভরে। লরীর আনন্দের সীমা নেই, লুসীর স্বামীকে নিরাপদ দেখে। নিঃসন্তান বৃদ্ধ লরীর জীবনে এখন যা কিছু আনন্দ, তা যে ঐ লুসীকে নিয়েই।

এদিকে এই আনন্দের বান ডেকেছে, অন্যত্র কিন্তু ডার্ণের প্রসঙ্গ নিয়ে ক্রোধ আর উত্তেজনার সীমা নেই। ডিফার্জের ঘরে সেই উত্তেজনার প্রবল ঢেউ! ডিফার্জের চাইতেও মাদাম ডিফার্জের বেশী ক্রোধ এভ্‌রিমণ্ডি-বংশের উপর। বিপ্লব আজ নারীর অন্তরের সমস্ত স্নেহ-মায়া-ক্ষমাকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে। তাছাড়া, আরো গভীর কারণ আছে। মাদামের প্রতিজ্ঞা—এভ্‌রিমণ্ডি-বংশকে ঝাড়ে-মূলে নির্মূল করতে হবে। এভ্‌রিমণ্ডি-বংশের ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ—প্রত্যেকেরই নাম মাদাম ডিফার্জের সেলাইয়ের ভিতর বুনোট করা রয়েছে। সে দুর্বোধ্য ভাষায় রেজিষ্ট্রী হয়ে গেছে যার নাম, তার আর নিস্তার নেই···কিছুতেই নেই!

ঐ এভ্‌রিমণ্ডি-পরিবারের এক ভূতপূর্ব মার্কুইস—গ্যাস্পার্ড যাঁর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে নিজে চল্লিশ ফুট উঁচু ফাঁসীকাঠে ঝুলেছিল—সেই ভূতপূর্ব মার্কুইসের প্রথম যৌবনের এক বীভৎস কুকীর্তির কথা বলতে হলো এবার। দরিদ্র প্রজাদের ঘরে সুন্দরী রমণী দেখলে তাঁর কামনা আগুনের মত লক লক ক'রে উঠত। ছলে-বলে-কৌশলে সে-নারীর সর্বনাশ করতেন তিনি। এক বালিকা

এইভাবে চরম লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা হলো তাঁর হাতে। মনোবেদনায় দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়লো সে, ঐ মার্কুইসেরই গৃহে। বালিকার পিতা ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিল একটু। সেই ধৃষ্টতার শাস্তিস্বরূপে তাকেও মরতে হলো ছুরিকাঘাতে। বালিকার ভ্রাতা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল মার্কুইসকে। শিক্ষিত তলোয়ার-বাজ মার্কুইসের সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারবে কেন? অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত কৃষক-বালক—সে-ও মরলো তরবারির আঘাতে।

দরিদ্র সেই-কৃষক-পরিবারের একমাত্র অবশিষ্ট প্রাণী, একটি শিশুকন্যা, ধর্ষিতা যুবতীর কনিষ্ঠা ভগ্নী—তাকে আত্মীয়েরা পাঠিয়ে দিলো দূরে, সমুদ্রতীরে এক ধীবর-পল্লীতে। সেইখানে সে মানুষ হলো, আপন মনে প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ করতে করতে মানুষ হলো যে প্রতিহিংসা নিতে হবে—প্রতিহিংসা নিতে হবে—প্রতিহিংসা! সেই মেয়েই আজ এই মাদাম ডিফার্জ!

এমন যে মাদাম ডিফার্জ সে কখনো এভ্‌রিমণ্ডি-বংশের বর্তমান মার্কুইস ডার্নেকে মুক্ত দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? যেভাবে হোক, মাদাম ডিফার্জ প্রতিহিংসার ব্রত উদ্‌যাপন করবেই, ধর্ষণকারী মার্কুইসের বংশ নির্মূল করে! আর, ডার্নে কিন্তু সেই ধর্ষকের দূর আত্মীয়ও নয়, আপন ভ্রাতুষ্পুত্র! ওর মৃত্যু চাই-ই!

মাদাম ডিফার্জ, জ্যাক্‌স্‌-সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলো গোপনে। স্বামীকেও সে এ-পরামর্শের ভিতর ডাকে নি, কারণ, ডিফার্জ একদা ডাক্তার ম্যানেটের অনুরক্ত ভৃত্য ছিল, সদাশয় প্রভুর কাছে সেদিনে যে স্নেহ সে লাভ করেছিল, তার কথা সে এখনো ভোলে নি। ডাক্তার ম্যানেটের জামাতাকে হত্যা করার পরামর্শে সে খুশী হয়ে সম্মতি দেবে না কখনো। তাই স্বামীকে গোপন করে, মাদাম ডিফার্জ চক্রান্ত করতে বসলো অন্য লোকের সঙ্গে! জ্যাক্‌স্‌-সঙ্ঘের ভিতর রক্ত-পিপাসু লোকের ত' অভাব ছিল না! গোটা সঙ্ঘটাই ত' গড়ে উঠেছে, ফরাসীদেশের

যাবতীয় নর-রাক্ষসদের (অবশ্য অত্যাচারেই রাক্ষস হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-সব মানুষ) একত্র করে!

এই গোপন চক্রান্তের ফল ফলতে বিলম্ব হলো না।

ডার্ণের মুক্তির উপলক্ষে সেদিন সন্ধ্যায় পারিবারিক উৎসবে মেতেছেন ডাক্তার ম্যানেট—এমন সময়ে অস্ত্রধারী নাগরিকেরা গিয়ে সাধারণতন্ত্রের নামে দ্বিতীয়বার বন্দী করলো ডার্ণেকে! অপরাধ, দেশদ্রোহ···জনসাধারণের উপর অত্যাচার! অপরাধ নিজের হোক বা পূর্বপুরুষের হোক, কথা একই!

এই আচম্‌কা বিপদ সবাইয়ের মাথায় এসে পড়ল যেন নীল আকাশ থেকে বজ্রের মত।

ডার্ণে আবার কারারুদ্ধ!

পরদিনই বিচার। প্রশ্ন উঠলো, আগের দিন যাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, আজ আবার তাকে পুনরায় অভিযুক্ত করা হলো কেন? তার উত্তরে একখানা কাগজ দাখিল হলো আদালতে।

ব্যাষ্টিল অধিকারের দিনে ডাক্তার ম্যানেটের ১০৫নং কারাগহ্বর থেকে যে কাগজখানা উদ্ধার করেছিল ডিফার্জ, এটা সেই কাগজ। ম্যানেট তাঁর কারাবাসের দিনে নিজের হাতে লিখে রেখেছিলেন —অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ! কে সেই অত্যাচারী? অত্যাচারী—মার্কুইস এভ্‌রিমণ্ডি! এভ্‌রিমণ্ডি-মার্কুইসের আবেদনেই ম্যানেট বিনা বিচারে আঠারো বছর বন্দী ছিলেন ব্যাষ্টিলের নির্জন কারায়।

হায় দুর্ভাগা ম্যানেট!

এই কাগজের কথা তাঁর একেবারেই স্মরণ ছিল না!

হ্যাঁ, এভ্‌রিমণ্ডি-বংশ যে তাঁর কারাবাসের কারণ, তা তিনি জানতেন। মার্কুইসের আহ্বানে একদা তাঁকে যেতে হয়েছিল এক পীড়িতা নারীর চিকিৎসার জন্য। সেখানে গিয়ে বিকারগ্রস্তা রোগিণীর প্রলাপ থেকে এক ভয়াবহ কাহিনী শুনতে পান তিনি।

রোগিণীর ভাইকেও দেখতে পান ঐ গৃহে, সে তখন মরতে বসেছে। তার বুকে তরোয়াল বিদ্ধ হয়েছে! রোগিণীর পিতাও নিহত হয়েছেন ঐ গৃহেই, এ-বৃত্তান্তও ম্যানেটের কানে আসে!

ম্যানেট ফিরে এলেন। কিন্তু মার্কুইসের ভয় রইলো—তাঁর এ অনাচারের ইতিহাস হয়তো ম্যানেট একদিন প্রকাশ করে দেবেন। দণ্ডের ভয় না থাক, কলঙ্কের ভয় মার্কুইসের ছিল। তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন ম্যানেটকে সরিয়ে ফেলবার। আচম্কা তাঁকে ধরে ব্যাষ্টিলে বন্দী করা হলো।

রাগে দুঃখে প্রতিহিংসার কামনায় ম্যানেট বুকের রক্তে লিখেছিলেন—এভ্রিমণ্ডির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের বিবরণ। সেদিন প্রতিহিংসায় অন্ধ ম্যানেট স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, ঐ বিবরণ থেকেই আজ তাঁর প্রাণাধিকা কন্যার প্রিয়তম স্বামীর জীবনান্ত ঘটবে। এর চেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস নিয়তির ভাণ্ডারে ত কিছু থাকতে পারে না!

এভ্রিমণ্ডি! ম্যানেটের শত্রু ওরা। কিন্তু কন্যার মুখ চেয়ে এভ্রিমণ্ডি-বংশধরকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। তখন কি জানতেন যে, তিনি এভ্রিমণ্ডিকে ক্ষমা করলেও, আর-একজন কেউ দুনিয়ায় আছে—যার কাছে এভ্রিমণ্ডি-বংশের ক্ষমা লাভের কোন আশাই নেই?

হ্যাঁ, এমন একজন আছে দুনিয়ায়। সে হলো, মাদাম ডিফার্জ।

জামাতার স্বপক্ষে তবুও ম্যানেট কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আদালত আর সে-কথায় কর্ণপাত করলো না। এভ্রিমণ্ডি-বংশের যে পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ ম্যানেটের লিখিত অভিযোগে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে স্বয়ং ম্যানেটের কোন কথাও কেউ আর শুনতে চাইলো না, অপরাধীর স্বপক্ষে।

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হলো।

ম্যানেট লুটিয়ে পড়লেন ডার্ণের পায়ের কাছে। তিনিই ঠেলে দিয়েছেন প্রিয় জামাতাকে, মৃত্যুর মুখে। তিনিই নিজের হাতে

প্রিয় কন্যাকে সাজিয়ে দিয়েছেন বিধবার বেশে! তিনিই নয়ন-মণি দৌহিত্রীকে করে দিয়েছেন পিতৃহীনা! হায় ভাগ্য!

ডার্ণে স্থির, গভীর, অবিচলিত। লুসীও তাঁকে বিদায় দিলেন কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে। যাও প্রিয়তম! আমার জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না তোমায়। আমিও এলাম বলে!—এই হলো লুসীর বিদায়-বাণী।

জানা গেল—অভিশপ্ত এভ্‌রিমণ্ডি-বংশের শেষ সন্তানকে পরদিন বেলা তিনটেয় গিলোটিনে নিক্ষেপ করা হবে।

আট মৃত্যু ও অমৃত

পাগলের মত ডাক্তার ম্যানেট ঘুরতে লাগলেন সহরের পথে-পথে। যে-যেখানে বন্ধু আছে, যেখানে তিলমাত্র সহানুভূতি পাওয়ার আশা আছে, সকলের দরজায় পাগলের মত ঘুরতে লাগলেন তিনি। এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডাক্তার হিসেবে বহু লোকের বহু উপকার তিনি করেছেন। কিন্তু কেউ-ই আজ বেপরোয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলো না। আর ওধারে তাঁর প্রতীক্ষায় ব্যাঙ্কের অফিসে বসে রইলেন লরী ও—

সিড্‌নী কার্টন!

সিড্‌নী কার্টন?—হ্যাঁ, সেই উচ্ছৃঙ্খল, সুরাসক্ত, চরিত্রহীন, মক্কেলহীন উকীল সিড্‌নী কার্টন! সে বহুদিন থেকে ফ্রান্সে রয়েছে। লুসীরা ডার্ণের অনুসরণ করে প্যারীতে উপনীত হবার ঠিক পরেই সে এসেছে। কিন্তু ঘটনার গতি লক্ষ্য করা ছাড়া আর কিছুই সে করে নি। কী-ই বা করবার ছিল? যেখানে ডাক্তার ম্যানেটের মত সম্মানিত ব্যক্তিকেই অগ্রসর হতে হয়েছে অতি সাবধানে, সেখানে বিদেশী সিড্‌নী কি করতে পারে? সে শুধু বাইরে-বাইরে সন্ধান

নিয়েছে, দুশ্চিন্তায় কাতর লুসীর কাছে গিয়ে সমবেদনা জানাবার প্রয়াস পর্যন্ত সে করে নি।

আজ, ডার্ণের ভাগ্য যখন চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে গেছে, সে এসে বসলো লরীর অফিসে।

এখানে সিড্‌নী কার্টনের আর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। যেদিন আদালতে তার চেহারার সমত্ব দেখিয়ে সে ডার্ণের মুক্তির উপায় করে দেয়, সেদিন স্বভাবতঃই ডাক্তার ম্যানেট আর লুসীর দৃষ্টি তার উপর পড়েছিল। ডার্ণের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও লুসীদের বাড়ীতে আসে। লুসীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে, ডার্ণের মতন সেও মুগ্ধ হয়। কিন্তু যখন জানতে পারলো, লুসী ডার্ণেকে ভালবাসে, তখন কার্টন তার মনের সমস্ত ভালবাসার খবর তার নিজের মনেই রুদ্ধ করে রেখে দিলো। জগতে আর কেউই সে-খবর জানলো না। লুসীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে কার্টনের অবলম্বনহীন জীবন ক্রমশঃ একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। আদালতে তার পসার একদম কমে গেল! শোনা গেল, লণ্ডনের আঁধার পল্লীর অন্ধকার হোটেলে-হোটেলে, দুশ্চরিত্র লোকেদের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায়। ক্রমশঃ সে নিজে ইচ্ছে করেই লুসীদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দিলো, কিন্তু লুসীকে না দেখে তার মন যখন হাঁপিয়ে উঠতো, তখন এক একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হতো। কিন্তু লুসীর সঙ্গে কোন কথা বড়-একটা বলতো না। লুসীর মেয়েকে আদর করে চলে যেতো। যতক্ষণ সে লুসীদের বাড়ীতে থাকতো, ততক্ষণ তার কথাবার্তায়, তার ভঙ্গীতে, কেউ বিন্দুমাত্র আপত্তি করবার কিছু পেতো না। লুসীদের বাড়ীতে না এলেও, লুসীদের সব খবরই সে রাখতো। তার গোপন ভালবাসার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কোন রকমে লুসীর সাহায্যে আসা। তাই যখন সে শুনলো, ডার্ণে ফ্রান্সে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে, তাকে উদ্ধার করবার জন্যে লুসীরাও ফ্রান্সে চলে গিয়েছে, সে আর লণ্ডনে বসে থাকতে পারে নি।

হ্যাঁ, একটা কাজ করেছে সিড্‌নী ইতিমধ্যে। সেই গুপ্তচর

বরসাদ। সে এখন ফরাসী-সাধারণতন্ত্রে চাকরি করে। সেই বরসাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেছে সিড্নী। লণ্ডনের ওল্ড বেইলী কোর্টে যখন মামলা হয় ডার্ণের, তখন এই বরসাদ ছিল সরকারপক্ষের সাক্ষী। সে যে গভর্ণমেণ্টের মাইনে-করা গোয়েন্দা, তার কাজই যে ছিল জনসাধারণের ভিতর ঘুরে-ঘুরে রাজদ্রোহীর সন্ধান করা, এটা একরকম প্রমাণই হয়ে গিয়েছিল সে-মামলায়। সিড্নী সে-কথা জানতো। আজ বরসাদ ইংলণ্ড থেকে তাড়িত হয়ে ফরাসী-সাধারণতন্ত্রের চাকরি নিয়েছে—প্রজাদরদী সেজে। তার পূর্ব-ইতিহাস যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই মুহূর্তে চাকরি ত' যাবেই তার, এই মুহূর্তেই বিদ্রোহীরা তাকে গিলোটিনের মুখে ফেলে দেবে।

হ্যাঁ, সিড্নী জানে বরসাদের পূর্ব-ইতিহাস। সিড্নী যদি বিরক্ত হয়, বরসাদের সর্বনাশ করতে পারে এক মিনিটে। ইংলণ্ডের সরকারী-গোয়েন্দার একটিমাত্রই স্থান আছে ফরাসী-সাধারণতন্ত্রে। সে-স্থান হলো, গিলোটিনের তলায়। কাজেই বরসাদ আজ সিড্নীর আজ্ঞাবহ। এবং—

এবং—বরসাদের চাকরি হলো কন্সিয়েরজারী কারাগারে। সেখানে সে প্রহরীদের একজন সর্দার। আর ঐ কন্সিয়েরজারী কারাগারেই থাকে সেই সব বন্দীরা, যাদের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ ডার্ণেও সেইখানেই।

ম্যানেটের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে-থাকতে সিড্নী চঞ্চল হয়ে উঠলো। ম্যানেট যা করবার, তা করুন! কিন্তু ধরে নেওয়া যাক, তিনি ফিরে এলেন ব্যর্থ হয়ে! তখন কী হবে? এই আসন্ন সর্বনাশ থেকে লুসীকে বাঁচাবার কোন উপায়ই কি সিড্নীর হাতে নেই?

লরীকে সে বললো—আপনি বসুন, আমি ঘুরে আসছি!

সিড্নী গেল বরসাদের সন্ধানে। তাকে খুঁজে বার করে অতি গোপনে, অতি সাবধানে সে তাকে বললো একটি কথা! একটি

মিনতি, একটি অনুরোধ, একটি আদেশ! সে আদেশ যদি অবজ্ঞা করে বরসাদ,—না! অবজ্ঞা করবার সাহস তার নেই, কেন-না তাতে নিশ্চিত মৃত্যু বরসাদের!

কিন্তু সে-আদেশ পালন করলেও যে মৃত্যু থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে, তার ভরসা কী? এত-বড় বিপজ্জনক কাজের কল্পনা কি ক'রে করলো সিড্নী, তাই ভেবে পেলো না বেচারী গুপ্তচর!

কিন্তু সিড্নী কঠোর, সিড্নী কোন কারণেই তার সংকল্প ত্যাগ করবে না। তার এ-আদেশ মানতেই হবে বরসাদকে! নইলে চললো সিড্নী বরসাদের পূর্ব-ইতিহাস প্রকাশ ক'রে দিতে! বরসাদ ভেবে দেখলো—সিড্নীর সাহায্য করলে, প্রাণ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু সাহায্য না করলে প্রাণ যাবেই। অতএব—

বরসাদের সঙ্গে সমস্ত পরামর্শ স্থির ক'রে, সিড্নী গেল এক ওষুধের দোকানে। কয়েকটা ওষুধ সে কিনলো। বিক্রেতা সাবধান ক'রে দিলো সিড্নীকে—ওষুধগুলি একসাথে মিশিয়ে ফেলবেন না কিন্তু! তাতে কী আশঙ্কা আছে, জানেন ত'?

—জানি—ব'লে সিড্নী বিদায় হলো।

তারপর সিড্নী গেল ডিফার্জের মদের দোকানে। এখানে সে যায় মাঝে-মাঝে। মার্কুইস এভ্রিমণ্ডির সঙ্গে চেহারার আশ্চর্য মিল আছে এই ইংরেজের, তা সবাই জানে ডিফার্জের দোকানে। সবাইকে এ-কথাটা আগে থাকতে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বিবেচনা করেছে সিড্নী।

মদের দোকানে ব'সে রইলো বহুক্ষণ সিড্নী। মদ খাবার ভানই করলো, কিন্তু খেলো খুব সামান্যই। আজ তার মাথা ঠিক রাখা প্রয়োজন। আজ মদ খেলে চলবে না। খবরের কাগজ আড়াল দিয়ে সুরাপানের ভানই করলো আজ সিড্নী। অবশেষে মদটা মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বেরিয়ে এলো।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

লরীর ঘরে তখনও লরী একা। তবে বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা

করতে হলো না। ম্যানেট ধীরে-ধীরে সিঁড়িতে উঠছেন শোনা গেল। ধীরে-ধীরে তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন।

খবর আর জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে হলো না। ম্যানেটের চোখের পাগলের মত দৃষ্টি, তাঁর কম্পিত পদক্ষেপ, তাঁর উস্কো-খুস্কো চুল—সব সমস্বরে ঘোষণা করলো—না, কিছু হয় নি, কিছু করতে পারি নি, কোন আশা দেয় নি কেউ!

কিন্তু সে যাই হোক, ম্যানেটের হলো কী? তিনি পাগলের মত চারিদিকে চাইছেন কেন? কী খুঁজছেন তিনি? তাঁর ভাব দেখে লরীর শঙ্কা হলো—তিনি হয়তো ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই!

লরীর মনে এক মহা আশঙ্কা জেগে উঠল। তবে কি এই শোকের ধাক্কায় ম্যানেট আবার পাগল হয়ে যাবেন? কিছুক্ষণ কাতর ভাবে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে, অতি ক্ষীণ স্বরে ডাক্তার ম্যানেট জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় গেল সেগুলো? আমার জুতো-সেলাইয়ের সরঞ্জামগুলো?

আকাশ ভেঙে পড়লো লরীর মাথায়!

ম্যানেট আবার পাগল হয়ে গেছেন!

আবার তাঁর মন ফিরে গেছে ব্যাষ্টিলের ১০৫ নং গহ্বরে, যেখানে সারা দিনমান তাঁর একমাত্র কাজ ছিল, জুতো সেলাই করা! দীর্ঘ দশ বৎসরের সংসার-ধর্মের ইতিহাস এক নিমেষে তিনি ভুলে গেছেন, ভুলে গেছেন লুসীকে পর্যন্ত—যে-লুসী হলো তাঁর চোখের আলো, বুকের রক্ত, ইহ-পরকালের একমাত্র অবলম্বন।

লরী আর কার্টন তাঁকে ধ'রে শুইয়ে দিলেন সোফার উপরে, আগুনের পাশে।—এখনই আনিয়ে দিচ্ছি আপনার সেলাইয়ের সরঞ্জাম—এই ব'লে আশ্বাস দিলেন অবুঝ পাগলকে। পাগল শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়লো সেই সোফায় শুয়ে!

তখন সিড্‌নী আর লরী পরস্পরের দিকে তাকালেন। লরীর চোখে শুধুই গভীর নৈরাশ্য। সিড্‌নীর চোখে গভীর নৈরাশ্যের ভিতরও ক্ষীণ একটু উত্তেজনার আভাস!

সে বললো—হ্যাঁ, সবই শেষ হলো বলা চলে। তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! কাল বেলা তিনটেয় ডার্ণের শেষ নিশ্বাস পড়বার কথা! ততক্ষণ—দেখা যাক কি হয়! আপনার পাসপোর্ট-গুলি তৈরী আছে ত'?

লরীর বোধগম্য হলো না—এ-সময়ে পাসপোর্টের কথা কেন? তবু তিনি পকেট থেকে বার ক'রে দেখালেন—একতাড়া কাগজ। সেগুলি ফ্রান্স ছেড়ে যাওয়ার অনুমতিপত্র! লরী, ম্যানেট, লুসী, ডার্ণে, লুসীর মেয়ে, লুসীর দাসী, লরীর ভৃত্য—সকলের জন্য এক-একখানা। সিড্‌নী নিজের পকেট থেকে ঐরকমই আর-একখানা পাসপোর্ট বার ক'রে লরীর হাতে দিলো। সেখানিতে নাম লেখা—সিড্‌নী কার্টন, এডভোকেট, ইংরেজ!

জিজ্ঞাসু নেত্রে লরী চাইলেন সিড্‌নীর পানে।

সিড্‌নী বললো—কাল বেলা দু'টোর সময় ম্যানেটের বাড়ীতে আমি আসবো। গাড়ীতে আপনারা সব উঠে ব'সে থাকবেন। প্রতীক্ষা করবেন আমার জন্য। আমি যে অবস্থাই এসে পৌঁছোই, তখনই আমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে গাড়ী চালিয়ে দেবেন সীমান্ত-পানে। কারণ, বিলম্বে বিপদের আশঙ্কা আছে। ডার্ণের প্রাণ যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ডার্ণের স্ত্রী-কন্যাকে বন্দী করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে—এভ্‌রিমণ্ডিদের চিরশত্রু মাদাম ডিফার্জ।

এ পরামর্শ মনঃপূত হলো লরীর। নিজের বা ম্যানেটের জন্য তিনি চিন্তিত নন, কিন্তু এভ্‌রিমণ্ডি-বংশের শত্রুদের হাতে, লুসী ও তার কন্যার বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা যে খুবই আছে, তা বোঝা শক্ত নয়। গভীর বিষাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি স্বীকৃত হলেন—কাল বেলা দু'টোয় তিনি গাড়ীতে সবাইকে তুলে নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন প্যারী ছেড়ে যাবার জন্য, সিড্‌নী এসে পৌঁছোলেই তাকে নিয়ে ছেড়ে দেবেন গাড়ী।

* * *

বেলা তিনটে! ডার্ণে শুনেছেন—বেলা তিনটেয় গিলোটিনের

ছুরি পড়বে তাঁর কণ্ঠে! তাঁর একার নয়, আরো একান্ন জন বন্দীর কণ্ঠে! বাহান্ন জন শত্রু নিপাত হবে সাধারণতন্ত্রের, ঐ একই সময়ে!

বেলা তিনটে! সকাল থেকেই ডার্ণের কানে ঘড়ির শব্দগুলো একটা বিশেষ বার্তা যেন শুনিয়ে শুনিয়ে যায়! সাতটা বাজলো। সাতটা বাজতে আর জীবনে শুনবে না ডার্ণে! আটটা! আটটার বাজনা জন্মের শোধ এইবার শুনে নাও ডার্ণে! নয়টা!—বারোটা! একটা...

ডার্ণে দু'টোর সময়ই তৈরী থাকবেন স্থির করেছিলেন! যাতে কারারক্ষীরা এসে এক সেকেণ্ডও দেরী করতে না বাধ্য হয়—মার্কুইস এভ্রিমণ্ডির জন্য!

কিন্তু—এ-এ-কী? সিড্নী কার্টন? সিড্নী কার্টন—লণ্ডন থেকে প্যারীতে? এই সময়ে? যাই হোক, যা মনে করেই এসে থাকুক কার্টন, একে দিয়ে লুসীকে একটা শেষ খবর পাঠানো যেতে পারে হয়তো! একটা শেষ বিদায়বাণী!

দু'একটা আজে-বাজে কথা বললো কার্টন! যেমন চিরদিন বলে সে! তারপর সে ডার্ণেকে বললো—একটা চিঠি লেখো তোমার স্ত্রীকে! আমি পৌঁছে দিতে পারবো!

ডার্ণে চিঠি লিখতে বসলেন। এ সময়ে মন স্থির ক'রে চিঠি লেখা সহজ নয়। তবে, ডার্ণের মন এ-অবস্থায়ও কতকটা স্থির। তা না হ'লে, এই বর্ষাধিক কালের অসহ্য অপমান আর যাতনায় কবে ভেঙে পড়তেন তিনি।

চিঠি লিখতে-লিখতে হঠাৎ ডার্ণের চোখে পড়লো—সিড্নী হাত দিয়েছে তার বুকের ভিতর। কী যেন টেনে বার করছে! কী অদ্ভুত! লোকটা কি অস্ত্র নিয়ে এসেছে এই হাজার পাহারাওলায় ঘেরা কারাদুর্গে? কী-জন্য? ডার্ণে প্রশ্ন করলেন, চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে—ও কী তোমার হাতে, কার্টন?

কিন্তু উত্তর শোনবার সময় আর হলো না ডার্ণের। একখানা রুমাল এসে চাপা পড়লো ডার্ণের নাকের উপর। ব্যাপার না বুঝতে পেরে, গিলোটিন-মুখী ডার্ণে সিড্নীর হাত ছাড়াবার জন্য ধস্তাধস্তি

করতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎই আক্রমণ করেছে সিড্‌নী, তারপর ঔষধটার কাজও হয় খুব তাড়াতাড়ি। তিনি হাত ছাড়াতে পারলেন না। অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন।

সিড্‌নী জানতো, জ্ঞান থাকতে ডার্ণে কখনও অন্যের জীবন নষ্ট ক'রে নিজের জীবন বাঁচাতে স্বীকার করবেন না। তাই এই কৌশল সিড্‌নীর।

ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে নিজের বসন, মায় টুপী জুতো রুমাল—ডার্ণেকে পরিয়ে দিলো সিড্‌নী। ডার্ণের চুলটি পর্যন্ত আঁচড়ে দিলো নিজের ফ্যাশানে। তারপর ডার্ণের কাপড় জামা নিজে প'রে দ্বারে টোকা দিলো। বাইরেই পাহারায় আছে বরসাদ, সে খুললো দরজা।

সিড্‌নী চোখ টিপে বললো—আমার বন্ধুটি মূর্ছা গেছেন প্রহরী! এঁকে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো!

চোখ টিপেই বরসাদ সম্মতি জ্ঞাপন করলো। দু'জন প্রহরী এলো তার আহ্বানে। তারা বরসাদের কথামত অচেতন ডার্ণেকে বহন ক'রে নিয়ে চললো দুর্গের বাইরে। দ্বার রুদ্ধ ক'রে বরসাদও চলল তাদের পিছনে। সিড্‌নীর শেষ আদেশ—ডার্ণেকে পৌঁছে দিতে হবে ম্যানেটের বাড়ীতে বেলা দু'টোর ভিতর। তা নইলে শেষ মুহূর্তেও সিড্‌নী বরসাদকে অভিযুক্ত ক'রে যাবে সরকারী-গোয়েন্দা ব'লে।

বরসাদ যেতে-যেতে উঁচু-গলায় হেঁকে ব'লে গেল—তুমিও তৈরী হও এভ্‌রিমণ্ডি! তিনটে বাজতে বাকী নেই বেশী!—ডার্ণের বাহকেরা হেসে উঠলো সে রসিকতা শুনে।

* * * *

সীমান্ত-পানে ছুটে চলেছে ঘোড়ার গাড়ী। সীমান্ত! এখানে যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা হবে। গাড়ী থামলো। লরী নেমে এসে সমস্ত কাগজপত্র দিলেন অফিসারের হাতে। একে-একে নাম ডাকতে লাগলেন অফিসার!

—আলেকজাণ্ডার ম্যানেট!—ডাক্তার!

লরী দেখিয়ে দিলেন—গাড়ীর এক কোণে বৃদ্ধ ডাক্তার নীচু

গলায় কাতর স্বরে কেবলই গোঙাচ্ছেন, কেবলই গোঙার্চ্ছেন···লরী বুঝিয়ে দিলেন—এভ্‌রিমণ্ডির শ্বশুর কিনা উনি! এভ্‌রিমণ্ডি এতক্ষণ গিলোটিনের তল্গায় নীত হয়েছে, সেই কল্পনাতেই কাতর হয়েছেন বৃদ্ধ। মনের দৃঢ়তা ওঁর নষ্ট হয়ে গেছে সেই আঠারো বছর ব্যাষ্টিলবাসের ফলে!

অফিসার রেগে উঠেছিলেন—এভ্‌রিমণ্ডির দরুন ম্যানেটের শোকের কথা শুনে। সাধারণতন্ত্রের শত্রুর জন্য যে কাঁদে, সেও ত শত্রু সাধারণতন্ত্রের!—কিন্তু পরমুহূর্তেই চতুর লরীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো ডাক্তারের ব্যাষ্টিলবাসের কাহিনী! অফিসার সামলে গেলেন! তাইতো! আঠারো বছর যে লোক ব্যাষ্টিলবাস করেছে, তাকে—আর যাই হোক—সাধারণতন্ত্রের শত্রু বলা চলে না।

—লুসী এভ্‌রিমণ্ডি! এভ্‌রিমণ্ডির স্ত্রী!

অশ্রুমুখী লুসীকে দেখিয়ে দিলেন লরী, সঙ্গে-সঙ্গে বলতে ভুললেন না যে, লুসী—ম্যানেটের কন্যা!

—লুসী এভ্‌রিমণ্ডি। এভ্‌রিমণ্ডির কন্যা!

শিশু লুসীকে দেখিয়ে দিলেন লরী।

—সিড্‌নী কার্টন, এডভোকেট, ইংরেজ!

গাড়ীর এক কোণে কাপড় চাপা দিয়ে প'ড়ে আছেন কার্টন। অফিসার বললেন—ভদ্রলোক কি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন?

—হ্যাঁ! এভ্‌রিমণ্ডির বন্ধু কিনা! শেষ সাক্ষাতের পর থেকেই অচৈতন্য।

—জার্ভিস লরী! ব্যাঙ্কার! ইংরেজ!

—আমি।

—যেতে পারেন!

গাড়ী চলেছে। মাঝে-মাঝে ঘোড়া বদলানো হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে। এক-একবার গাড়ী থামে, আর ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে ওরা! এ-গাড়ী কি আর ছাড়বে না? কখন আসবে নতুন ঘোড়া? যদি কেউ পেছন থেকে ধেয়ে আসে? যদি এই প্রকাণ্ড ছলনার কথা প্রকাশ

হয়ে প'ড়ে থাকে ? দেখুন, দেখুন, মিষ্টার লরী ! বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখুন—পেছনে ও শব্দ কিসের ?

নাঃ, ও কিছু নয় !

হঠাৎ গাড়ীর কোণ থেকে কাপড়ে-ঢাকা অচেতন কার্টন-বেশী ডার্ণে ব'লে উঠলো—তোমার বুকে ওটা কি লুকিয়ে রেখেছো কার্টন ? তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিলো রোরুদ্যমানা লুসী। কেউ শুনলো না ত' ? ধীরে ধীরে কেটে আসতে থাকে ডার্ণের মূর্ছার ঘোর।

গাড়ী চলছে। নাঃ, পিছনে আসে নি কেউ, পলাতক আসামী ধরবার জন্য। শুধু পিছনে ধাওয়া করে চলেছে পাগল হাওয়া, ধাওয়া করে চলেছে কালো-কালো মেঘ, নীল-আকাশে ভেসে ভেসে আসছে সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থীর চাঁদ, ঘোর নিশীথিনী এলো চুল নাচিয়ে ছুটেছে পলাতক-আসামীর পিছনে-পিছনে। তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখে লুসী, আর লুসীর অন্তর বলে ওঠে, ধন্যবাদ ভগবান—সাধারণতন্ত্রের সৈনিক কাউকে ত' পিছনে দেখি না।

* * * *

বেলা তিনটে বাজে ! রাজপথে চলেছে ছ'খানা খোলা গাড়ী ! বাহান্ন জন লোক সেই ছ'খানা গাড়ীতে। যুবক, বৃদ্ধ, যুবতী, বৃদ্ধা—শিশুও দু-একজন। ধনী মানী জমিদার, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, দরিদ্র শ্রমিক—সব আছে সেই গাড়ীতে।

অশ্বারোহী প্রহরী চলেছে ঐ ছ'খানা গাড়ী বেষ্টন ক'রে। তরোয়াল উঁচিয়ে তারা দেখিয়ে দিচ্ছে একজন বিশেষ বন্দীকে !—ঐ সেই এভ্রিমণ্ডি ! যে মুক্তি পেতে-পেতে আবার ধরা পড়েছে ! গিলোটিনকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সোজা ?

এভ্রিমণ্ডি একটি ক্ষীণা বালিকার সঙ্গে কথা কইতে ব্যস্ত ! অন্য কোনদিকে দৃষ্টি নেই তার ! বালিকার বয়স আঠারো-উনিশের বেশী হবে না, একান্ত নিরীহ গোবেচারী সে ! তাকেও ধ'রে এনেছে সাধারণতন্ত্রের শত্রু ব'লে ! বিপ্লবের সেই পাগলামির দিনে, বিচার

ছিল প্রহসন।—যে-কেউ একজন এসে যা-হোক একটা অভিযোগ করলেই হলো! তাহ'লেই গিলোটিন!

বালিকা কাতর হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল এভ্রিমণ্ডির পাশে! সে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, আশা দিয়েছে, মৃত্যুর মুখোমুখি শান্তভাবে দাঁড়াবার সাহস দিয়েছে সে!

জনতার ভিতর কোলাহল উঠলো—নিপাত হোক এভ্রিমণ্ডি! সাধারণতন্ত্রের শত্রু সবাই নিপাত হোক! অভিজাত বড়লোক নিপাত হোক সবাই!

একটা লোক ব'লে উঠলো—থামো। থামো! এভ্রিমণ্ডি ত' নিজের সাজা মাথা-পেতেই নিতে চলেছে! আর অভিশাপ কেন?

এ হলো, মিঃ বরসাদ।

ঢং ঢং ঢং, তিনটে বাজলো!

ঘ্যাঁচ!—একটা মাথা গড়িয়ে পড়লো ঝুড়ির ভেতর!

ঘ্যাঁচ—আর একটা।

মাদাম ডিফার্জের সঙ্গিনীরা গিলোটিনের অদূরে ব'সে আছে চেয়ারে! হাতে তাদের উল আর কাঁটা! তারা গুনে যাচ্ছে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ···

ক্ষীণা বালিকাটি এভ্রিমণ্ডিকে বলছে—

—শেষ সময়ে তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান্! তোমায় পেয়ে তবে আমি ভগবানকে স্মরণ করতে পেরেছি।

—কিচ্ছু ভেবো না বোন! আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে শুধু! অন্য কোন দিকে তাকিয়ো না! এক সেকেণ্ডে শেষ হয়ে যাবে! তারপর ভগবানের রাজ্য! আনন্দের দিন! কোন ভয় নেই!

এমন সময় এলো মেয়েটির ডাক।

এভ্রিমণ্ডি-রূপী সিড্নীই ধীর-হস্তে ঠেলে দিলো মেয়েটিকে। সিড্নীর দিকে দুই আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি রেখে সে অবনত করলো নিজের মাথা! সে চক্ষুর দৃষ্টিতে ভয়ের লেশ নেই, আছে অশেষ বিশ্বাস।

সেই অন্তিম দৃষ্টির সামনে মেয়েটি স্পষ্ট দেখলো, সিড্নীর

পরিবর্তে তার সামনে দাঁড়িয়ে আলোক-মূর্তি যীশু, দুই হাত প্রসারিত ক'রে। সিড্‌নীর মুখ থেকে শান্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো যীশুর পরম আশ্বাস-বাণী,—আমিই পুনর্জীবন! আমিই অনন্ত জীবন! আমাতে যে বিশ্বাস করে, মরেও সে বাঁচবে! আমাতে যে বিশ্বাস করে, মৃত্যু নাই তার!

আনন্দে ভরে ওঠে মেয়েটির শেষ মুহূর্ত!

একটা ক্ষীণ শব্দ হয় শুধু। মেয়েটির ছিন্ন মাথা ঝুড়িতে গিয়ে পড়ে। উল বুনতে বুনতে মহিলারা গোনে—বাইশ!

এবার ডাক পড়লো, এভ্‌রিমণ্ডি!

সিড্‌নী বুক ফুলিয়ে গিলোটিনের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ-কণ্ঠের স্তিমিত কলরব কানে আসে তার। চোখে পড়ে লক্ষ আব্‌ছা মুখ! উন্মত্ত জনতার উল্লাসধ্বনি তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ে···কিন্তু সিড্‌নীর চোখের সামনে তখন জ্বলছে শুধু একটা আলো। কে যেন সিড্‌নীর কানে কানে বলে, এস বন্ধু, এস ক্লান্ত পথিক!

উপর থেকে নেমে আসছে গিলোটিনের ধারাল ছুরি।

উল বুনতে বুনতে মহিলারা গোনে—তেইশ!

সমাপ্ত